অনীশ দেব পরিবেশিত

কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা

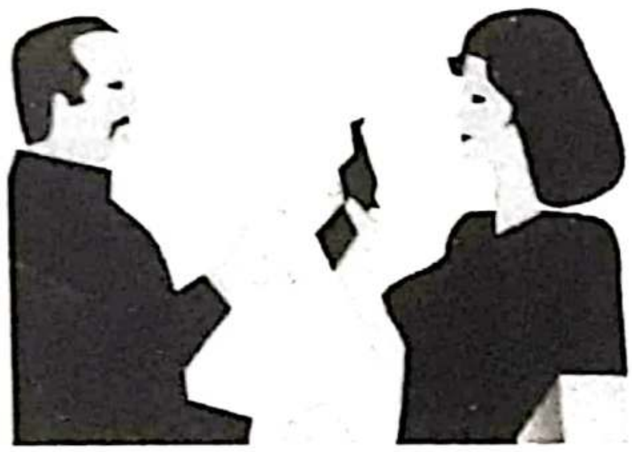
বারোজনের কলমে দুরন্ত রহস্য থ্রিলার



প্ল্যানচেট দিয়ে শুরু
খুন দিয়ে শেষ...
খুনির খোঁজে মধুবন্তী সেন
তারপর???

অনীশ দেব ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী সৈকত মুখোপাধ্যায়
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত নির্বেদ রায়
দীপান্বিতা রায় অনন্যা দাশ
দেবতোষ দাশ জয়ন্ত দে
ইন্দ্রনীল সান্যাল কাবেরী রায়চৌধুরী

পত্রভারতী
ISBN 978-81-8374-388-4
9788183743884
www.bookspatrabharati.com



কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা

অনীশ দেব পরিবেশিত

কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা

অনীশ দেব

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

সৈকত মুখোপাধ্যায়

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

নির্বেদ রায়

দীপান্বিতা রায়

অনন্যা দাশ

দেবতোষ দাশ

জয়ন্ত দে

ইন্দ্রনীল সান্যাল

কাবেরী রায়চৌধুরী

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুদীপ্ত দত্ত

KICHU MEG KICHU KUYASHA
Edited by Anish Dev
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 160.00

ISBN 978-81-8374-388-4

বারোয়ারি নয়, একের পিঠে বারো

প্রচ্ছদে 'পরিবেশিত' শব্দটার আসল অর্থ, এই রহস্য থ্রিলারের 'পরিবেশ' আমিই তৈরি করেছিলাম। এই উপন্যাসটির নাম 'কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা' রেখেছিলাম আমিই। আর তার সঙ্গে উপন্যাসের সূচনা-অধ্যায়টা আমারই লেখা। সুতরাং এইভাবে 'পরিবেশ' তৈরির ভূমিকার জন্যই বোধহয় বন্ধু ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রচ্ছদে ঘোষণা করেছেন 'অনীশ দেব পরিবেশিত'।

অনুজ লেখক অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী প্রথম এইরকম একটি বারোয়ারি উপন্যাসের আয়োজনের কথা ভাবেন। সেই ভাবনায় জারিত হয়ে 'কিশোর ভারতী'-র সম্পাদক ত্রিদিবকুমার উৎসাহিত হন এবং তাঁর সবুজ সংকেত পেয়ে আমরা বারোজন কাজে নেমে পড়ি। 'কিশোর ভারতী'-র পাতায় প্রথম অধ্যায় লিখলাম আমি। আর তার পর একে-একে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী, সৈকত মুখোপাধ্যায়, হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, নির্বেদ রায়, দীপান্বিতা রায়, অনন্যা দাশ, দেবতোষ দাশ, জয়ন্ত দে, ইন্দ্রনীল সান্যাল এবং কাবেরী রায়চৌধুরী। এইভাবে একটি কাহিনির পিঠে সওয়ার হয়ে গেছি বারোজন—একের পিঠে বারো। প্রত্যেকের হাতে খোলা কলম। একডজন কলমের কালির রেখায় বোনা হয়ে গেল রহস্যে টানটান এক বিনুনি। প্রত্যেক লেখকের লেখার ধার তাঁর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায় দেখ।

বাংলা সাহিত্যে 'বারোয়ারি' উপন্যাস নতুন কিছু নয়। কিন্তু 'বারোয়ারি' রহস্য উপন্যাস? সেটা কি নতুন? বোধহয় তা বলা যায়।

কারণ, এর আগে এইরকম একটিমাত্র যৌথ প্রচেষ্টা হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। পাঁচজন লেখক মিলে লিখেছিলেন 'পাঞ্চজন্য' নামে একটি রহস্য উপন্যাস। লেখক তালিকায় ছিলেন সুকুমার সেন, সমরেশ বসু, আনন্দ বাগচী, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় এবং সুভদ্রকুমার সেন। ওঁরা পাঁচজনে মিলে লিখেছিলেন ছ'টি অধ্যায়। তবে কোন অধ্যায় কে লিখেছিলেন বইয়ে তার উল্লেখ ছিল না।

এই নজিরটিকে মনে রেখেও বলা যায়, আমাদের এই 'বারোয়ারি' রহস্য উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে প্রথম। প্রথম হতে কে না চায়! তাই এই উপন্যাসটির লেখক হিসেবে আমরা বারোজন একসঙ্গে ফার্স্ট হয়েছি। একসঙ্গে ফার্স্ট হওয়ার এই আনন্দ আমাদের কাছ থেকে কেউ কোনওদিন কেড়ে নিতে পারবে না।

আমাদের আনন্দের এই উৎসবে আপনাকেও পাশে চাই আমরা। পাঠক হিসেবে। তাই বারো কলমে লেখা একুশ শতকের এই স্মার্ট থ্রিলার আপনাকে পড়তেই হবে। পড়বেন না বলুন?

২২ নভেম্বর, ২০১৫

অনীশ দেব

১

বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যেতেই সিদ্ধেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এ মেঘনার গাড়ির সিগনেচার হর্ন। বেশ একটা অদ্ভুত সুরে বাজে। তা ছাড়া হর্নটা এত শার্প যে, বৃষ্টির ছমছম শব্দ ডিঙিয়ে দিব্যি কানে এসে পৌঁছচ্ছে। সিদ্ধেশ বুকের ঢিপঢিপ শুনতে পেল। শব্দটা সেখানেও পৌঁছে গেছে।

সিদ্ধেশ জানলার কাছে গেল। ও একটু পা টেনে-টেনে চলে। ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার গোড়ালিতে চোট পেয়েছিল। অর্থোপিডিক ডাক্তার দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। একটা স্থায়ী সিলমোহর এঁকে দিয়েছে। সেজন্য সিদ্ধেশ মাঝে-মাঝেই মন খারাপ করে গুম হয়ে বসে থাকে। সারা শরীরে এই এক কণা অসুবিধের জন্য বরাবরের 'প্রতিবন্ধী' তকমা কারই বা ভালো লাগে! তার ওপর লোকজনের বাড়তি সহানুভূতি। ওঃ, অসহ্য!

কপালের ওপর থেকে চুলের ঝালর সরিয়ে দিল সিদ্ধেশ। তারপর বৃষ্টির ঝালরের ফাঁক দিয়ে দেখল। লাল রঙের হুন্ডাই, আই টেন। অবশ্যই মেঘনার গাড়ি।

মেরুন জিগ্যেস করল, 'কী রে, মেঘনা নাকি?'

সিদ্ধেশ ছোট্ট করে 'হ্যাঁ' বলল, মেরুনদের দিকে একবার দেখল।

বিশাল গোল টেবিল ঘিরে তিনজন : মেরুন, চিন্নি, আর প্রলয়েশ। আড্ডা গল্পে মশগুল। সামনে দুটো বড়-বড় বাটিতে তেল দিয়ে মাখা মুড়ি, তার সঙ্গে কাঁচালঙ্কা, বাদাম ভাজা। পাশে একটু পুরোনো খবরের কাগজের ওপরে একগাদা বেগুনি আর আলুর চপ। তার পাশেই একটা মার্বেল পাথরের অ্যাশট্রে। কিন্তু তার পাশে?

তার পাশে বোতল আর গ্লাস। গ্লাসে বাদামি তরল। প্রলয়েশ মুড়ি-তেলেভাজার ফাঁকে-ফাঁকে তাতে চুমুক দিয়ে চলেছে।

বহুভাবে চেষ্টা করেও প্রলয়েশের এই মদভ্যাস ছাড়ানো যায়নি।

সিদ্ধেশ, মেরুনদের চেয়ে প্রলয়েশ বয়েসে অন্তত বছর দশেকের বড়। পেশায় জ্যোতিষী। বেশ ভালো পসার। বছর দুয়েক আগে একবার মেরুন ওর কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিল। মেরুনের সময় ভালো যাচ্ছে না বলে ওর বাবা-মা কোন এক রেফারেন্স থেকে যেন প্রলয়েশের খোঁজ জোগাড় করেছিলেন। একবার হাত-টাত দেখানোর পরই প্রলয়েশকে মেরুনের কেমন যেন ভালো লেগে যায়। ও বুঝতে পারে, পেশায় জ্যোতিষী হলেও প্রলয়েশের নানান বিষয়ে জানকারি আছে। ও নিশ্চয়ই রেগুলার পড়াশোনার মধ্যে থাকে। যদিও প্রশ্ন করলে প্রলয়েশ সব হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, 'আমি আলাভোলা, কিন্তু প্রফেশনাল জ্যোতিষী! যা বলি, করি, সবই মহেশ্বরের ইচ্ছেয়...।'

অদ্ভুত ব্যাপার হল, কয়েক মাসের মধ্যে মেরুনের তিন বন্ধু, সিদ্ধেশ, চিন্নি আর মেঘনার অ্যাস্ট্রোলজার দেখানোর দরকার পড়েছিল। মেরুনই প্রলয়েশের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। তারপর, ছ'-সাত মাসের যাতায়াতে প্রলয়েশ কী করে যেন ওদের অনেকটা কাছাকাছি চলে এল। সেই থেকে ওদের যে-কোনওরকম আচার অনুষ্ঠানে প্রলয়েশকে ওদের চাই-ই চাই। ওদের বাবা-মায়েরও প্রলয়েশের ওপরে দারুণ ভরসা।

মেরুন আর সিদ্ধেশ প্রলয়েশকে অনেকবার বলেছে, 'প্রলয়েশদা, তোমার লালজলের এই বাজে নেশাটা ছেড়ে দেওয়া যায় না?'

'কী করে যাবে বল? আমার নামের মানেই হল, রুদ্র, নটরাজ। আমি যা করি সবই মহেশ্বরের ইচ্ছেয়...।'

'কিন্তু তোমার লিভারটার কথা তো একবার ভাববে! ওটা ড্যামেজ হয়ে গেলে...।'

সিদ্ধেশকে থামিয়ে দিয়ে প্রলয়েশ বলেছে, 'তোরা জানিস না, আমার লিভার বলে কিছু নেই!'

এরপর আর কথা বাড়ানো যায়নি।

একটু থেমে প্রলয়েশ বলেছে, 'বৎসগণ, জেনে রাখো, আমার ডাকনাম হচ্ছে মালামাল উইক্‌লি। উইকে একবার আমার মাল চাই-ই চাই—অ্যাট লিস্ট মেডিসিন হিসেবে। তো এভ্‌রি সানডে আমাকে শিবের এই প্রসাদ চড়াতে হয়।'

আজ সেই সান্‌ডে। সুতরাং প্রলয়েশ একেবারে নটরাজের মেজাজে।

কিন্তু আজ সিদ্ধেশরা পাঁচ বন্ধু মিলে এমন একটা 'অনুষ্ঠান' করতে চলেছে যেখানে প্রলয়েশের থাকাটা ভীষণ জরুরি। কারণ, প্রলয়েশ প্ল্যানচেট সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।

সিদ্ধেশ টেবিলের দিকে একপলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'যাই, দরজা খুলে দিয়ে আসি। এখন শুধু সিতির অপেক্ষা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে সিদ্ধেশ চিন্নিকে বলল, 'অ্যাই, চিন্নি—সিতিকে আর-একবার কল কর না...।'

চিন্নি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'সরি বস, পারব না—ব্যালেন্স নেই।'

'তোর কোনও সময়েই ব্যালেন্স থাকে না...।'

নীচে নেমে সদর দরজার খিল খুলতেই সামনে মেঘনা। হাতের রঙিন ছাতাটা ভাঁজ করে বাঁ-হাতে ধরা। টপটপ করে জল পড়ছে। আঙুলে ঝুলছে গাড়ির চাবি।

মেঘনার মুখের দিকে তাকাল সিদ্ধেশ। বৃষ্টির ব্যাকড্রপে ওর ফরসা মুখটা কেমন মিস্টিরিয়াস দেখাচ্ছে। গায়ে হাতকাটা লাল রঙের একটা ড্রেস। চোখে কাজলের ছোঁওয়া। ডানহাতে একটা কালো রঙের নকশা কাটা সাইডব্যাগ।

মেঘনার পারফিউমের গন্ধে ডুবে গেল সিদ্ধেশ। এত রূপ, রস, গন্ধ—ডুবে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

চুল ঠিক করার অছিলায় একবার মাথা ঝাঁকাল সিদ্ধেশ। এই ঝাঁকুনিটা ওকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে নিয়ে এল।

'আয়, ভিতরে আয়—' মেঘনাকে ইশারায় ভেতরে ডাকল সিদ্ধেশ : 'দোতলার বড় ঘরটায় সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে।

প্রলয়েশদা রিচুয়াল্‌সের সবকিছু চেক করে নিয়েছে—।'

সিঁড়ি উঠে বিশেষ ঘরটায় ঢোকার আগে মেঘনার ভেজা ছাতাটা চেয়ে নিল সিদ্ধেশ। হাতে হাত লেগে গেল।

সিদ্ধেশ মেঘনার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু দেখল মেঘনা তখন ঘরের আর তিনজনের সঙ্গে 'হ্যালো-হাই' করতে ব্যস্ত।

চিন্নি বলল, 'কী ব্যাপার রে? সো লেট!'

'লেট কোথায়?' হাতঘড়ির দিকে তাকাল মেঘনা ঃ 'সবে তো হাফ পাস্ট ফোর—!'

চিন্নি, মেরুন আর প্রলয়েশ এ-বাড়িতে বেলা একটা নাগাদ এসে পৌঁছেছে। বাড়িটা যেহেতু সিদ্ধেশের গ্র্যান্ডফাদারের তাই সিদ্ধেশকে অতিথি বলে ভাবা যাবে না। মেঘনা বলেছিল ওর কীসব যেন অ্যাপো আছে, তাই ও সেকেন্ড হাফে আসবে। আর সিতি বলেছিল, সকালবেলাতেই আসবে—কিন্তু আসেনি। ওকে অনেকবার ফোন করা হয়েছে, কিন্তু ফোন ধরলে তো! ও যা মুডি পাবলিক! তা ছাড়া লাস্ট দু-তিনটে উইক ধরে ওর বিহেভিয়ারটা কেমন যেন। ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু মেরুন, কিন্তু ও-ও ঠিকঠাক কোনও খবর দিতে পারছে না।

'মেঘনা চাইতেই জল।' প্রলয়েশ গম্ভীর গলায় বলল। শব্দ করে হাতের গ্লাসটা টেবিলে রাখল।

মেঘনা ভুরু কপালে তুলল, 'তার মানে?'

'তার মানে, তুমি নিশ্চয়ই মনে মনে চেয়েছিলে। তাই এমন আকাশভাঙা বৃষ্টি—।'

প্রলয়েশের কথা শেষ হতে না হতেই বেশ জোরে বাজ পড়ল কোথাও।

মেরুন এক মুঠো মুড়ি মুখে গুঁজে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঃ 'সিদ্ধেশ, আমি সিতিকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু তিনবার রিং হওয়ার পরই ফোন কেটে দিল। মনে হয় বিজি আছে—।'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল মেরুন। কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর লম্বা-চওড়া শরীরটাকে হঠাৎই যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই ও আনমনাভাবে বলল, 'এর আগেও তিনবার রিং করেছিলাম...কিন্তু তিনবারই ও ফোন কেটে দিয়েছিল। শি নোজ মাই নাম্বার। তা হলে ফোন কাটল কেন?'

কেউ কোনও জবাব দিল না। ঘরের গুমোট ভাবটা যেন হঠাৎই বেড়ে গেল। মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানটা আগের মতোই বনবন করে ঘুরছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেরুনের গরম লাগছিল।

ও সিতির কথা ভাবছিল। বেশ কালো—কৃষ্ণকলি মেয়ে। লম্বা, স্লিম, টানা-টানা চোখ। বেশ কিছুদিন ধরে মেরুনকে ও পকেট মানির টানটানির কথা বলছিল। মেরুনের থেকে পাঁচশো টাকা ধারও করেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে আজ না আসার কী সম্পর্ক? আজকের প্ল্যানচেটে ওরই তো মিডিয়াম হওয়ার কথা! প্রলয়েশদা সেরকমই কথাবার্তা বলে রেখেছিল।

মনোযোগ দিয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগল মেরুন। ঘরবাড়ি, গাছপালা, গাড়ি-ঘোড়া, কাক-চড়ুই সবই বৃষ্টিতে ভিজছে। বৃষ্টি তো শুধু বাইরেটাই ভেজাতে পারে! অথচ মেরুনের ভেতরটা কেন যে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাচ্ছে কে জানে! বৃষ্টি পড়লে ওর সিগারেট ধরাতে দারুণ ইচ্ছে করে। কিন্তু ওর মুডটাই অফ হয়ে গেছে। জিভটা তেতো লাগছে।

সিতিটা একটা হোপলেস! আজকের সন্ধেটা ভেস্তে দিল!

আজ ও যদি মিডিয়াম না হয় তা হলে হবেটা কে?

যাকগে! ওটা প্রলয়েশদার প্রবলেম। প্রলয়েশদা বুঝবে।

পাখার হাওয়ায় টেবিলে পাতা খবরের কাগজের কোনা উড়ছিল—তাতে খসখস শব্দ হচ্ছিল। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সবাই চুপ। এমনকী চ্যাটারবক্স চিন্নি—সেও চুপ।

প্রলয়েশ হঠাৎ গলাখাঁকারি দিল। তারপর ঃ 'শোনো , আমরা কিন্তু কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টা বেজে তেরো মিনিটে প্ল্যানচেট স্টার্ট করব। কিন্তু সিতি তো এল না...বোধহয় আর আসবে না। তা হলে মিডিয়ামের চেয়ারে কাকে বসাব?'

এ-প্রশ্নে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎই মেঘনা বলে উঠল, 'প্রলয়েশদা, আমি কিন্তু মিডিয়াম হতে পারব না—।'

'তুমি কোন দুঃখে মিডিয়াম হবে, মা-মণি? তুমি তো ম্যাক্সিমাম।'

প্রলয়েশের কথায় সবাই হেসে ফেলল। ভারী গুমোটটা একটু হালকা হল বোধহয়।

মেঘনা মেরুনকে কয়েক লহমা দেখল। কেমন যেন বেলুন-ফুস্‌স দেখাচ্ছে। বোধহয় সিতির সঙ্গে ওর কিছু একটা প্রবলেম চলছে। কিন্তু সব রিলেশানশিপেই তো প্রবলেম থাকে! লাইফে যদি কোনও প্রবলেমই না থাকল তা হলে টোটাল লাইফ স্প্যানে আর কী-ইবা সল্‌ভ করবে মানুষ!

মেঘনা আগে কখনও এ-বাড়িতে আসেনি—এই প্রথম। তাই ও ঘরটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিল। উঁচু সিলিং। সিলিং-এ কড়িবরগা। রং-টং যা কিছু সব পুরোনো হয়ে চটে গেছে। একটা ইয়া লম্বা ডাউন রড থেকে পুরোনো মডেলের পাখাটা ঝুলছে। ঘরে চারটে বড়-বড় জানলা—তার মধ্যে দুটো রাস্তার দিকে। সব ক'টা জানলায় নকশা কাটা লাল আর সবুজ কাচ। এক দিকের দেওয়ালে দু-জানলার মাঝে একটা বেশ বড় মাপের অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম ক্লক। ঘরের মেঝেতে সাদা আর গাঢ় ছাই রঙের ইটালিয়ান মার্বেল বরফি ঢঙে পাতা। তার হরেক জায়গায় আঁকাবাঁকা ফাটল।

গোটা বাড়িটা ফাঁকা—কেউ থাকে না এখানে। একমাত্র সিদ্ধেশরা কেউ এক-দু-রাতের জন্য থাকতে এলে তবেই বাড়ির তালা খোলা হয়। কেয়ারটেকার বজরঙ্গী ওর বউ নিয়ে একতলার একটা ঘরে থাকে। খাবারদাবার কিনে আনার দরকার হলে বজরঙ্গী সেই সার্ভিস দেয়।

সিদ্ধেশরা মাঝে-মাঝেই এখানে পিকনিক-টিকনিক করতে আসে। আর কখনও বা প্ল্যানচেট কিংবা তুকতাক। ওদের প্ল্যানচেট আর তুকতাকের নেশা ধরিয়েছে প্রলয়েশদা। প্রলয়েশ জ্যোতিষী, তবে ব্ল্যাক ম্যাজিক, অকাল্ট এসব নিয়েও চর্চা করে। সবসময় বলে, 'তোমরা তো অনেক হাই-ফাই লেখাপড়া করেছ—অনেক জ্ঞান

তোমাদের। জ্ঞানের অনেক প্রদীপ জ্বেলেছ। কিন্তু প্রদীপের নীচের অন্ধকারটার কথা কি ভুলে গেছ? ভুলে যেয়ো না, আলো যেমন সত্যি, অন্ধকারটাও তেমনই সত্যি...।'

প্রলয়েশ যখন এসব কথা বলে তখন চিন্নি, সিদ্ধেশ, মেরুন, ওদের কেমন গা শিরশির করে। তার ওপর প্রলয়েশের কপালের ওই সিঁদুরের টিপ। টিপ তো নয়, বরং সিঁদুর লেপা বলাই ভালো। তাকে ঘিরে গোলগাল ভারী মুখ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। ঘন দাড়ি। গায়ে লালচে-কমলা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। সব মিলিয়ে কেমন যেন কাপালিক-কাপালিক দেখায়।

কিন্তু প্রলয়েশের অনেক পজিটিভ দিক আছে। ওদের সবার পারসোনাল লাইফের অনেক প্রবলেম ও সল্‌ভ করে দেয়। আর ওর সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি হচ্ছে, একজনের পারসোনাল কথা ও অন্য কাউকে কখ্খনও বলে না। শুধু যে 'বলে না' তাই নয়—ও যে কারও পারসোনাল কথা জানে সেই কথাটাও প্রলয়েশের ঠোঁট চিরে কখনও বেরোয় না। সেইজন্যেই প্রলয়েশের সবার সঙ্গে ভাব। আর ওর সঙ্গে মিশেই সিদ্ধেশ, মেরুন চিন্নিদের প্ল্যানচেট, ব্ল্যাক ম্যাজিক, তুকতাক এসব নিয়ে ইন্টারেস্ট বেড়েছে। তাই প্রলয়েশ সিয়াঁসের কথা বললে কেউ আর আপত্তি করে না। আর ওরা সবাই জানে, প্ল্যানচেটের ক্রিয়াকর্ম শুরু হলে প্রলয়েশই তখন হিরো।

খুচরো গল্প, পড়াশোনা নিয়ে মন্তব্য, ফেসবুক, এস.এম.এস. চালাচালি, মুড়ি আর তেলেভাজায় সময় কাটছিল।

পেন্ডুলাম ঘড়িতে 'ঢং' করে সাড়ে পাঁচটা বাজতেই চিন্নি বলে উঠল, 'প্রলয়েশদা, এবার প্রিপারেশান স্টার্ট করুন। দেখতে-দেখতে ছ'টা তেরো বেজে যাবে...।'

প্রলয়েশ 'হুম' শব্দ করল। শব্দ করে একটা ঢেঁকুর তুলল। তারপর হাতঘড়ির দিকে দেখল। হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটা জাস্ট পার হয়েছে। আর দেরি করার মানে হয় না।

অসমাপ্ত বোতলের ছিপি এঁটে দিল। সেটা হাতে নিয়ে পায়ে-পায়ে ঘরের একটা কোণ লক্ষ করে এগিয়ে গেল। সেখানে লাল

রঙের একটা ঝোলাব্যাগ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আছে।

ব্যাগের ভেতরে বোতলটা সাবধানে ঢোকাল। তারপর সেই ব্যাগ থেকেই বের করল প্ল্যানচেটের নানান সরঞ্জাম।

একটা ছোট কালো পাথরের থালা। কয়েকটা লাল রঙের ফুল, একটা সিঁদুরের প্যাকেট। আর একটা তেলে ভেজানো খাটো মাপের পুতুল। মাটির মতো কোনও নমনীয় জিনিসকে আঙুলে টিপে-টিপে পুতুলটা তৈরি করা হয়েছে।

দেওয়ালের গা ঘেঁষে জিনিসগুলো সাজাল প্রলয়েশ।

প্রথমে থালার ওপরে সিঁদুর ছড়িয়ে হাত বুলিয়ে মেখে দিল। তারপর ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে থালায় ছড়িয়ে দিল। তার ওপরে পুতুলটাকে শুইয়ে দিল।

ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বের করল। সেটা থালার পাশে রাখল। তারপর ব্যাগ থেকে বেরোল শেষ কয়েকটা আইটেম ঃ কয়েকটা এ-ফোর মাপের কাগজ, একটা পেনসিল, আর একটা উইজা বোর্ড—চলতি কথায় যেটা প্ল্যানচেট বোর্ড।

প্ল্যানচেট বোর্ডটা লাল রঙের—চারপাশে হলদে বর্ডার। তার মাঝে কালো রঙে কয়েকটা ছোট-বড় ত্রিভুজ আঁকা। মাঝখানের বড় ত্রিভুজটার ভেতরে একটা চোখ আঁকা রয়েছে।

প্রলয়েশ যখন এইসব কাজে ব্যস্ত তখন মেরুন, চিন্নি, সিদ্ধেশ আর মেঘনা সিতিকে নিয়ে ডিসকাস করছিল।

মেরুন বলল, 'সিতিটা দু-সপ্তা ধরে কেমন যেন ইর‌্যাটিক আর সিরিয়াস হয়ে গেছে।'

'যাই বল, ও কিন্তু আজকাল একটু খিটখিটে হয়ে গেছে।' চিন্নি মন্তব্য করল, 'খুব অল্পেতেই ইরিটেটেড হয়ে যায়। তা ছাড়া মাঝে-মাঝেই কেমন ঝিমিয়ে পড়ে...বড়-বড় শ্বাস টানে। দেখে মনে হয় অ্যাজ্‌থ্‌মার পেশেন্ট—।'

সিদ্ধেশ মাথার চুলে হাত বুলিয়ে ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ধীরে-ধীরে মন্তব্য করল, 'ও হস্টেল থেকে ওই ওয়ান রুম ফ্ল্যাটে

শিফ্‌ট করার পর এইসব প্রবলেম শুরু হয়েছে। তা ছাড়া, হু নোজ, আজেবাজে নেশায় জড়িয়েছে কি না! একসময় তো ভালোই স্মোক করত...।'

মেঘনা হাত নেড়ে বলল, 'প্লিজ, এসব নেগেটিভ পিএনপিসি ছাড়। স্ট্রেটকাট বল তো, সিতি আজ আসতে পারবে না কেন? ওর কোনও প্রবলেম হয়েছে?' প্রশ্নটা করে মেরুনের দিকে তাকাল মেঘনা।

মেরুন মাথা নাড়ল ঃ 'জানি না। যতবারই রিং করছি, কেটে দিচ্ছে। কে জানে, হয়তো আদারওয়াইজ বিজি আছে...।'

চিন্নি কয়েক সেকেন্ড এর ওর দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আসলে ওর ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স বইটা বেরোনোর পর ওর ঘমন্ড্ প্যারামিটার চড়ে গেছে—।'

রিসেন্টলি সিতি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্সের বই লিখেছে। বইটা শুধু যে দারুণ চলছে তা-ই নয়, নানান ইন্‌স্টিটিউটের বেশ কয়েকজন সিনিয়ার প্রফেসর বইটার খুব প্রশংসাও করেছেন।

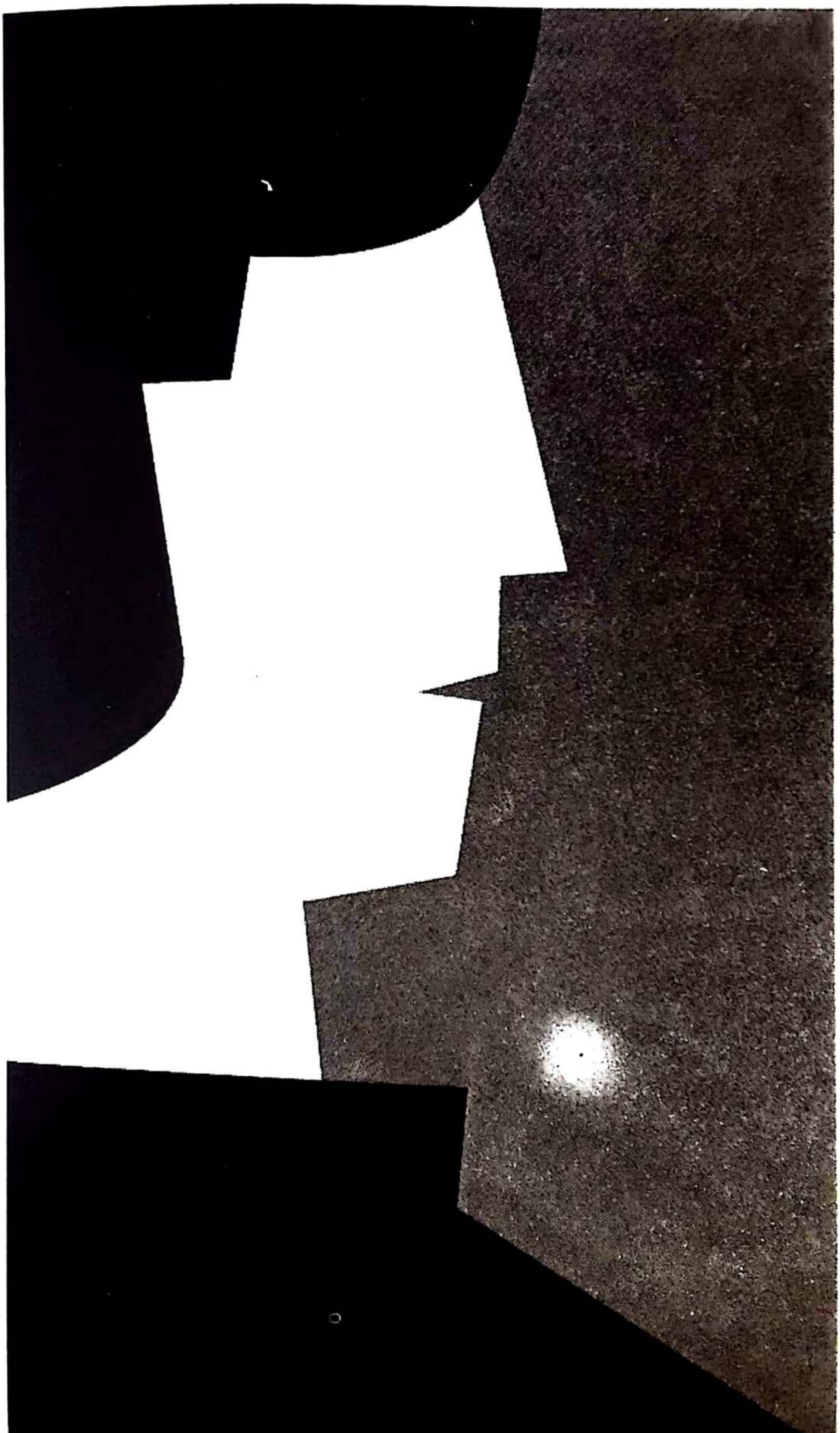
সিতি বই লিখলে সে-বই যে কোয়ালিটি বই হবে তাতে চিন্নিদের কারও একফোঁটাও সন্দেহ নেই। কারণ, সিতি পড়াশোনায় টপার। ক্লাসে ওর প্রশ্নে অনেক স্যারই নাজেহাল হয়ে যান।

বইটা লিখে সিতি বেশ কিছু টাকা হাতে পেয়েছিল। হয়তো সেই ভরসাতেই হস্টেল ছেড়ে ছোট একটা ফ্ল্যাটে শিফ্‌ট করেছিল। হস্টেলে নাকি এত ডিস্টারব্যান্স যে ওর পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছিল না, আর নতুন একটা বই লেখার যে-কাজ শুরু করেছিল সেই কাজটাও খুব হ্যাম্প্যার্ড হচ্ছিল।

প্রলয়েশ হাঁক পাড়ল, 'সবাই রেডি? অ্যাই সিদ্ধেশ, জলদি টেবিলটা ফাঁকা করো...।'

প্রলয়েশের কথায় বাকি চারজন চটপট হাত লাগাল।

দেখতে-দেখতে টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেল। মুড়ির বাটি দুটো চলে গেল টেবিলের নীচে। আর তেলেভাজার দাগে ভরা খবরের কাগজ চলে গেল ঘরের কোণে। প্রলয়েশ টেবিলে ওর প্ল্যানচেটের



সরঞ্জাম সাজাতে লাগল।

উইজা বোর্ড, কাগজ, পেনসিল সব পরিপাটি করে সাজিয়ে ঘড়ি দেখল প্রলয়েশ। তারপর টেবিলের কাছটিতে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়তে লাগল।

প্রলয়েশের দিকে চোখ পড়তেই বাকি চারজনের কথাবার্তা আচমকা থেমে গেল।

সময় হয়ে এসেছে। এবার তৈরি হতে হবে।

চোখ খুলে প্রলয়েশ সবাইকে চেয়ার সাজাতে বলল। টেবিল ঘিরে গোল করে পাঁচটা চেয়ার সাজানো হল। ওরা পাঁচজন চেয়ারে বসল।

'আজ তো সিতি নেই...' প্রলয়েশ সিরিয়াস গলায় বলল, 'তা হলে এখন কে মিডিয়াম হবে?'

শুরু হল চাপা গুঞ্জন, কথা চালাচালি, এ ওকে মিডিয়াম হওয়ার জন্য বলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কেউই রাজি হল না।

তখন প্রলয়েশ বলল, 'ও. কে.—আজ তা হলে মিডিয়াম ছাড়াই প্ল্যানচেট হবে। সবাই রেডি তো? সব মোবাইল ফোন সুইচ অফ করে দাও, নয়তো সাইলেন্ট মোডে রাখো—।'

মোবাইল ফোন বের করে চারজন খুটখাট করল। তারপর ছোট্ট-ছোট্ট শব্দ করে 'রেডি' বলল।

তখন প্রলয়েশ চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল দেওয়ালের কাছে। ঝুঁকে পড়ে দেশলাইয়ের বাক্স তুলে নিয়ে 'ফস্' করে একটা কাঠি জ্বালল। তারপর পাথরের থালায় শোয়ানো পুতুলটায় আগুন ধরিয়ে দিল। পুতুলটা কী দিয়ে তৈরি কে জানে—দিব্যি জ্বলতে লাগল।

দেওয়ালে আঁটা সুইচবোর্ডের কাছে পৌঁছে গেল প্রলয়েশ। ঘরে দুটো আলো জ্বলছিল—দুটোই অফ করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের অ্যামবিয়েন্সটা বদলে গেল।

পুতুলের আলোয় ঘরের দেওয়ালে অদ্ভুত আকারের সব ছায়া তৈরি হয়েছে। কিছুটা আলো গিয়ে পড়েছে জানলার রঙিন কাচে।

কাচগুলো চকচক করছে। জানলার বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার।

প্রলয়েশ চাপা গলায় বলল, 'ও. কে., গাইজ। যার-যার পাশের লোককে টাচ করে থাকো। আমিই আজ মিডিয়াম হচ্ছি। কাগজের ওপরে পেনসিল ধরছি। তোমরা সবাই চুপচাপ থাকো। কোনও শব্দ কোরো না। আর খুব ডিপলি কারও কথা ভাবো, কনসেনট্রেট করো...।'

মেঘনা ছাড়া বাকি তিনজন আগে কয়েকবার এরকম সিঁয়াসে বসেছে। তাই চিন্নি ফিসফিস করে ওকে ব্রিফ করছিল।

এবং কয়েক সেকেন্ডেই ওরা 'কনসেনট্রেশান' ক্যাম্পের সুবোধ বাসিন্দা হয়ে গেল। একমনে কাউকে না কাউকে ভাবতে বসল।

মেরুন একমনে সিতির কথা ভাবছিল। সিতি বেসিক্যালি একজন ভাবুক টাইপের সিরিয়াস মেয়ে। ভাবে অনেক বেশি, তুলনায় কথা বলে অনেক কম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কখনও বোঝা যায় না ও মনে-মনে কী ভাবছে। মেরুন জানে, সিতি বেশ কয়েকবার প্রলয়েশদাকে মিট করেছে। প্রফেশনাল হেল্‌পের জন্য। তবে কী নিয়ে কথা হয়েছে সেটা ও জানে না।

সিদ্ধেশ মেঘনার কথা ভাবছিল। ওর পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল পুতুল পোড়া গন্ধ। মেঘনা এখন মনে-মনে কী ভাবছে কে জানে!

মেঘনা সিতির কথা ভাবছিল। সিতি নিজেকে বড্ড বেশি ইন্টেলেকচুয়াল ভাবে। সবসময় ওর এই ব্যাপারটা সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স হয়ে রেডিয়েট করে। এটা মেঘনার খুব বাজে লাগে। এই যে আজকের এই প্ল্যানচেটের প্রোগ্রাম—এটাতে না আসার কী হয়েছে? মেঘনা তো অনেক কাজ ছেড়ে দেরি করে হলেও এই বৃষ্টির মধ্যে নিজে গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির হয়েছে! বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব! তার কাছে অন্য কোনও ফ্যাক্টর বড় হতে পারে না!

চিন্নিও সিতির কথাই ভাবছিল। বেশি-বেশি! পড়াশোনায় না হয় ও একটু বেশি ভালো—তাই বলে এত ঘ্যাম? পরে ওর সঙ্গে দেখা হোক, খুবসে ঝেড়ে দেবে। তারপর যা হয় হবে!

খসখস শব্দ হল একটা। তারপর কাঠের ওপরে তিনবার ঠক-ঠক আওয়াজ।

সবাই টেন্‌স্‌ড হয়ে গেল। কেউ কি এসেছে?

চিন্নি নিজেকে ধমক দিল মনে-মনে। এরকম একটা সময়ে সিতির কথা ভাবাটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। প্রলয়েশদার কাছেই ও শুনেছে, প্ল্যানচেট করার সময় জীবিত কোনও মানুষের কথা ভাবতে নেই। তা হলে...তা হলে...সে...।

একটা মেটালিক সাউন্ড শোনা গেল। একটা মুড়ির বাটি নড়ে উঠেছে।

চিন্নি আড়চোখে তাকাল টেবিলের নীচে। সেখানে ঘন ছায়া। অন্ধকার। সেভাবে কিছু দেখা গেল না।

এমন সময় প্রলয়েশের পেনসিল ধরা হাত নড়তে লাগল। আর ও ওপর দিকে মুখ তুলে ফিসফিস স্বরে অদ্ভুত এক গা-শিরশির করা আওয়াজ করতে লাগল ঃ 'সি-ই-ই-ই! সি-ই-ই-ই!'

চিন্নি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। ওর শরীরটা কাঠ-কাঠ হয়ে গেল।

এইরকম ব্যাপার আরও কিছুক্ষণ চলতে লাগল। তারপর একসময় প্রলয়েশ টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল। ঝিমোনো গলায় টেনে-টেনে বলল, 'আলোগুলো জ্বেলে দাও...জ্বেলে দাও...।'

সিদ্ধেশ উঠে গিয়ে সুইচ অন করে দিল। আলো জ্বলে উঠল।

পুতুলটা পুড়ে-পুড়ে দলা পাকিয়ে গেছে। তবে এখনও জ্বলছে। ছড়ানো শিখার সঙ্গে কালো ধোঁয়া। সকলের চোখ জ্বালা করছে।

মেরুনের পকেটে অনেকক্ষণ ধরেই মোবাইল ফোনটা ভাইব্রেট করছিল। ফোন ধরার জন্য ওর মন ছটফট করছিল। কিন্তু প্ল্যানচেট সেশান চলছিল বলে পারছিল না।

আলো জ্বলতেই ফোনটা ও পকেট থেকে বের করে একপলক দেখল।

ও ভেবেছিল সিতি ফোন করেছে, কিন্তু সিতি নয়। অচেনা নম্বর। 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে ফোন কানে দিল মেরুন।

'মেরুন? মেরুন বলছ?' একজন ভদ্রমহিলার গলা। উত্তেজিত। কাঁপছে।

'হ্যাঁ—বলছি...।'

'আমি সিতির ছোটমাসি বলছি। তুমি শিগগির সিতির ফ্ল্যাটে চলে এসো। আমরা সেখানেই আছি। তাড়াতাড়ি এসো—।'

'কেন? কী হয়েছে?'

ভদ্রমহিলা উত্তর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ঃ 'সর্বনাশ হয়েছে। সিতিকে ওর ঘরে ঢুকে কেউ মার্ডার করে গেছে...।'

মেরুনের পায়ের তলা থেকে পলকে মাটি সরে গেল।

২

সিলিং থেকে পুরোনো পাখাটা দুলে-দুলে ঘুরছে। বাইরের টানা ছিপছিপ বৃষ্টির সঙ্গে ওর কিচকিচ শব্দটা মিশে এক অদ্ভুত সুর তুলেছে। ঘর জুড়ে ফ্যাটফেটে আলো ছড়িয়ে আছে।

পাথরের থালায় শোয়ানো পুতুলটা পুড়ে ছাই। একটা কালো বিকৃত মণ্ড। পাশে প্ল্যানচেট বোর্ড, কাগজ-পেনসিল। ফুলের পাপড়ি, সিঁদুরের ওপর ছাইয়ের গুঁড়ো।

মেঘনা একটা চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আছে। চোখ বন্ধ।

চিন্নি জানালার শিক ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। ওর গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধেশ বাঁদিকের প্রাচীন জলচৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

দুটো তালুর ওপর মুখ গুঁজে টেবিলে ঝুঁকে আছে মেরুন। ওর লম্বা-চওড়া শরীরটা দমকে-দমকে কেঁপে উঠছে।

প্রলয়েশ ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে যাচ্ছে। তার চক্ষুদুটি এখন আরও লাল। বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কীসব আওড়ে যাচ্ছে। একবার ঘরের কোনায় রাখা তার লাল রঙের

ঝোলাটার কাছে চলে গেছিল। হাত ঢুকিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু কী ভেবে হাত টেনে বের করে নিয়েছে।

প্রকাণ্ড হলঘর জুড়ে এখন শ্মশানের নীরবতা।

কয়েকমিনিট কেটে গেল।

মেঘনা উঠে এসে মেরুনের পিঠে হাত রাখল। ফিসফিস করে বলল, 'মেরুন! মেরুন।'

প্রলয়েশ হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ছেড়ে দে। ওকে আরেকটু কাঁদতে দে। হালকা হোক।'

'কাঁদব? কেঁদে...কেঁদে কী হবে? সিতি...সিতিকে আমরা...' ফোঁপানির আবেগে মেরুনের কথা বুঁজে গেল।

চিন্নি জানালার দিক থেকে এগিয়ে এল। ওড়নায় চোখ মুছতে-মুছতে ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমি...আমি অপরাধী। আমার জন্যেই সিতি—'

'কী বাজে বকছিস?' প্রলয়েশ ধমকে উঠল।

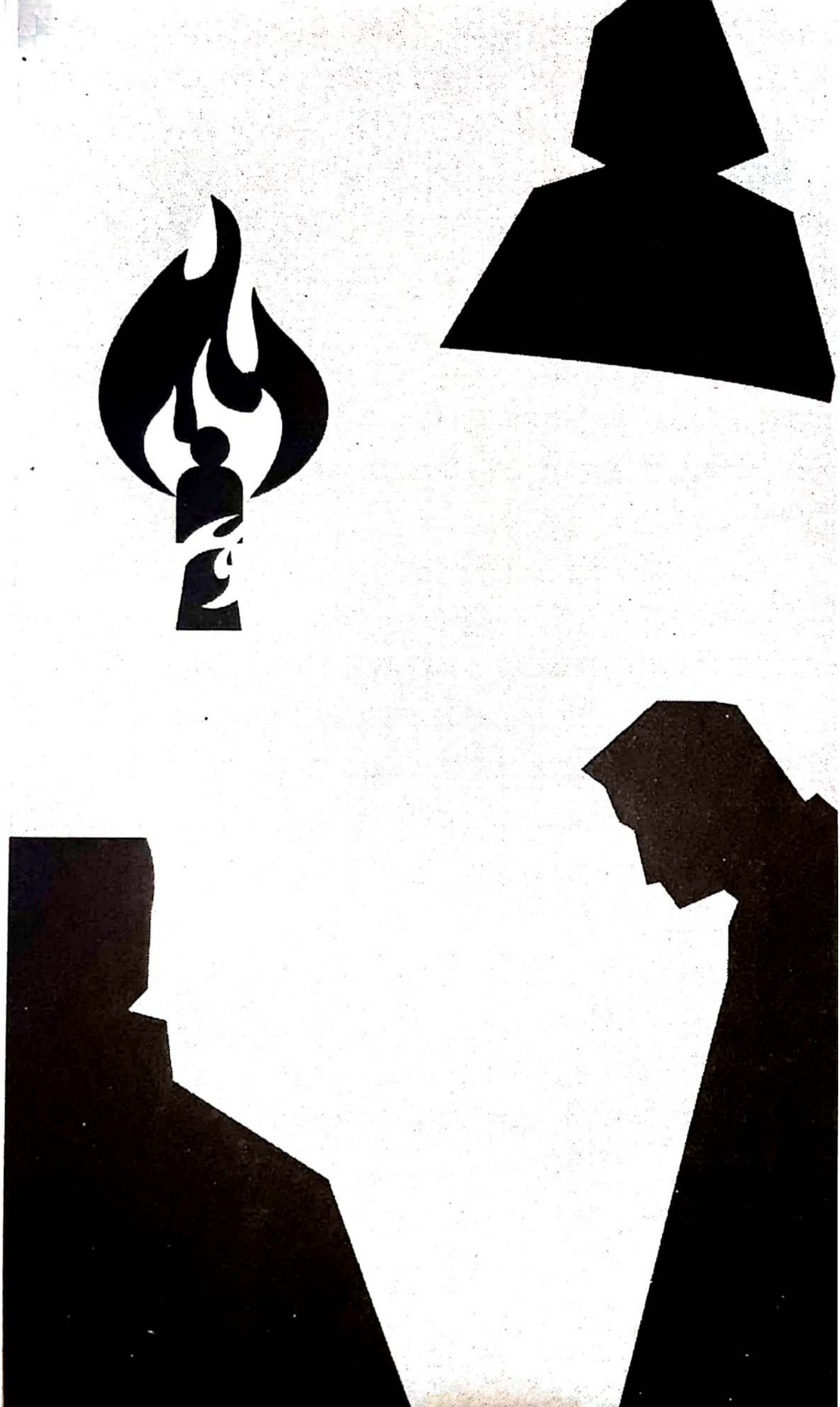
'না প্রলয়েশদা! ইট্স ফ্যাক্ট। তুমি মানা করেছিলে। তবুও আমি সিতির কথা—'

'তুই একা কেন, আমিও ভেবেছি। ভাবতে না চাইলেও...ওর অ্যাবসেন্স...বন্ধুত্ব...শুধু ওরই কথা বারবার চলে আসছিল!' মেঘনার গলা কাঁপছে। চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছে। ওর আই-লাইনার ধেবড়ে গেছে। শুকনো জলের রেখা।

'আর আমি? আমায় বাদ দিচ্ছিস কেন?' মেরুন হঠাৎ মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ!...আমি সব জেনেও...আজ এল না...আমার ফোন বারবার কেটে দিচ্ছিল...তোরা তো জানিস, আমার সঙ্গে ওর সামহাউ একটা...কী করব, অ্যাঁ?...ওর মানিটারি প্রবলেম...কেন হবে? বলত না...যখন যা চেয়েছে, দিয়েছি...তবু সব চেপে...উঃ!'

চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে মেরুন। চোখ বিস্ফারিত, অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি।

চৌকিতে উঠে বসেছে সিদ্ধেশ। বিড়বিড় করে বলল, 'পাঁচজনে তিন জন।'



'রাইট!' প্রলয়েশ ওর দিকে তাকাল। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। শান্তগলায় বলল, 'কুল ডাউন মাই ফ্রেন্ডস। তোরা ওর কথা না ভাবলেও এটাই ঘটার ছিল। ঘটেছে। ওর নিয়তি। ডেসটিনি।'

'তা ছাড়া প্রলয়েশদা', সিদ্ধেশ বলল, 'সিতি সুইসাইড করেনি, অ্যাকসিডেন্টেও মারা যায়নি। ইটস আ মার্ডার। আমাদের প্ল্যানচেটের টানে মার্ডারার এসে ওকে খুন করে চলে গেল! হয় নাকি? ইমপসিবল!'

প্রলয়েশ মাথা নাড়ল। বলল, 'নাথিং ইস ইমপসিবল ইন দিস ওয়ার্ল্ড। আমরা আলোকেই দেখতে পাই, অন্ধকারকে কি দেখতে পাই?...এনিওয়ে মেরুন, তুই কি ভেবেছিস? এখন আমরা কী করব?'

'যাব। এখনই ওর ফ্ল্যাটে যাব। ওখানে ওর আত্মীয়রা—'

'নিশ্চয়ই যাব।' হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিল প্রলয়েশ, 'এসময়ে পাশে থাকতেই হবে। তার আগে একটা কথা বল্। সিতির ছোটমাসি তোকে ঠিক কী বললেন? সিতি ফ্ল্যাটে একা থাকত। খুনের খবরটা উনি পেলেন কী করে? কখন পেলেন?'

'আমার কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না প্রলয়েশদা। তোমরা দেখেছ। উনি নিজে থেকে যেটুকু বললেন, সেটা হল, ছ'টা কুড়ি নাগাদ ওদের বাড়ির ল্যান্ডলাইনে একটা ফোন আসে। পুরুষের গলা। সিতির খুনের খবরটা সে জানায়।'

'মাই গড্! মিলে গেছে। ও-ই খুনি। ছোটমাসি কি সিতির ফ্ল্যাটের কাছাকাছি থাকতেন?

'হ্যাঁ। সিতি ফুলবাগান, ছোটমাসি কাঁকুড়গাছি। কিন্তু তুমি সিওর হচ্ছ কী করে, যে ফোন করেছে, সে-ই খুনি?'

'ভেরি সিম্পল। পাশের ফ্ল্যাটের অন্য কেউ খবরটা জানবে না, যদি না চিৎকার, চেঁচামেচি হয়। ছোটমাসির নাম্বারটা খুনি পেয়েছে সিতির মোবাইল থেকে। তা ছাড়া—'

চারজন প্রলয়েশের দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে।

'তা ছাড়া খুনিটাকে একটু আগেই আমি দেখতে পেয়েছি। নাহ্!

চিনতে পারিনি। গাট্টাগোট্টা চেহারা। চোখে চশমা। মাঝবয়েসি একটা লোক। মুখটা কেমন ঝাপসা।...নইলে—

'নইলে?' মেরুন উত্তেজনায় কাঁপছে।

'তুমি দেখতে পেলে? কখন?' মেঘনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

প্রলয়েশ আবার অস্থিরভাবে ঘরের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত পায়চারি করছে।

'মুখটা ঠিকঠাক দেখতে পেলে একটা স্কেচ করে ফেলতাম। আই'ল ট্রাই এগেন! তবে তার আগে সিতিকে...ইয়েস! সিতিকে আমার চাই।'

'কখন দেখলে?' মেঘনা ফের বলল।

'এই একটু আগে। পায়চারি করতে-করতে। ধরে ফেলব, ঠিক ধরে ফেলব। জাস্ট সিতির হেল্প চাই।'

সিদ্ধেশ উঠে এসে চেয়ারে বসল। থেমে-থেমে বলল, 'এর আগেও আমরা প্ল্যানচেটে বসেছি! জ্যোতি বসু থেকে রবিশঙ্কর সবাইকেই তুমি টেনে এনেছ। বেশিরভাগ সময়ে চিন্নি মিডিয়াম হয়েছে। প্রলয়েশদা, তুমি কিন্তু কোনওবারই মিডিয়াম হওনি। এবারে সিতির মিডিয়াম হওয়ার কথা ছিল। আমরা মিডিয়াম ছাড়াই বসেছিলাম।...এবারেই...তিনবার খটখট শব্দ হল...তারপর মুড়ির বাটিটা নড়ে উঠল...তোমার হাতে পেনসিল...হঠাৎ তুমি কাঁপতে-কাঁপতে দুবার চেঁচিয়ে উঠলে...সি-ই-ই! তারপর...টেবিলে ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় করে কাতরে উঠলে, আলোগুলো জ্বেলে দাও।...তুমি কি এটা মনে করতে পারছ?'

প্রলয়েশ ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল। তার চোখমুখ উত্তেজনায় ফুটছে।

'মনে? মনে করতে পারব না! কী বলছিস? উঃ! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সিতি ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে! আমার মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছে...মাই গড্! আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না...সিতি আসবে কী করে...জলজ্যান্ত মেয়েটা...তার স্পিরিট...কী ভয়ংকর শক্তি...আমার মধ্যে ঢুকবেই...বাধা দিচ্ছিলাম প্রাণপণে...চলে যা, ফিরে যা,...সে শুধু

বলে যাচ্ছে...বলতে দাও...উঃ! আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে...ওঃ! তখন তাকে বের করে দিতে আমার চিৎকার না করে...ওঃ!'

প্রলয়েশ হাঁফাচ্ছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

সকলে স্তব্ধ।

'ও কি এখনও এ-ঘরে আছে?' মেঘনা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলছে।

'না মনে হয়।...তাড়িয়ে দিয়েছি। মেয়েদের বড় অভিমান। তবে—'

'তবে?'

'ওকে আবার আনতেই হবে! আনব। না এসে ও পারবে না। বন্ধুত্বের প্রবল টান ছেড়ে বেশি দূর যেতে পারেনি।'

'আমরা...তুমি কি আবার প্ল্যানচেটে বসার কথা ভাবছ প্রলয়েশদা? ওর ফ্ল্যাটে যাব না? সেখানে ওর রিলেটিভরা সবাই ওয়েট করছে।' মেরুন কান্নাভেজা গলায় বলল।

প্রলয়েশ তাকাল। বলল, 'হ্যাঁ, জানি। পুলিশ এখন সিতির বডি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করবে। পোস্টমর্টেম হবে।...এক মিনিট। বিজিতকে একবার ফোন করে দেখি।'

'বিজিত?'

'আমার স্কুলফ্রেন্ড। কলকাতা পুলিশের ইনস্পেকটর। দেখি, ফুলবাগান থানার কোনও কনট্যাক্ট নাম্বার দিতে পারে কিনা।'

প্রলয়েশ ট্রাউজারের পকেট থেকে মোবাইল বের করল।

'হ্যালো। বিজিত? ফুলবাগান থানার ওসি-র মোবাইল নাম্বারটা দিতে পারিস? আর্জেন্ট দরকার। মানে তুই যদি আমার রেফারেন্স...কী? তুই এখন ওসি? ওয়াট আ কোইনসিডেন্স!...হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি। তোর এলাকায় একটা ফ্ল্যাটে মার্ডার...কী? ওখানেই আছিস?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ভেরি ক্লোজ ক্লায়েন্ট তো বটেই ছোটবোন, বন্ধু সব। খুব ভালো মেয়ে!...না, না, বুঝতেই পারছি না, কে ওকে মার্ডার করবে? কেন?...তোরা সিওর নয়? কেন?...সে তো দরজায় অটোম্যাটিক

লক। বাইরে থেকে টেনে দিলে এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে।...আচ্ছা, আচ্ছা।...ও.কে....ও.কে.।...একটা রিকোয়েস্ট করব?...মানে...আমরা...হ্যাঁ ওর বন্ধুদের পৌঁছোতে অ্যানাদার ওয়ান আওয়ার লাগবে। ততক্ষণ যদি...মানে প্রসেসটা যদি একটু লেনদি...পাশের ফ্ল্যাটের লোকজনকে ইনটারোগেশন...খুব ভালো হয় রে! ওরা ওকে খুব দেখতে চাইছে। অনেকটা দূর থেকে আসছে...থ্যাঙ্কিউ রে।'

ফোনটা কেটে দিয়েই প্রলয়েশ ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল।

'হুম্! পুলিশ এখনও সিওর হতে পারছে না, সিতি খুন হয়েছে কিনা। কারণ ওর শরীরটা বিছানায় টানটান হয়ে পড়েছিল। কোনও ইনজুরি নেই। ডাইনিং টেবিলে একটা আধখাওয়া পাউরুটি আর চিকেন স্টু। ওর মুখে এখনও পাউরুটির গুঁড়ো লেগে আছে। শুধু গ্লাসে যে তরলটা ছিল, সেটা রঙিন, জল নয়। রঙিন তরলটার কয়েক ফোটা বেডকভারে পড়েছে। দাগ আছে। আশপাশের লোকজন বলছে, ও কারও সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলত না। নীচের পানদোকানি বলেছে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ একজন অচেনা লোক উপরে উঠেছিল। তবে সে কোন ফ্ল্যাটে গেছে, জানে না।...এই হল বিজিতের সিনপসিস। আরও এক ঘণ্টা ও সিতির বডি ওখানেই রাখার ব্যবস্থা করছে। সোও গাইজ! রাইট নাও, উই হ্যাভ টু স্টার্ট। সময় নেই।'

সিগারেট টানতে-টানতে প্রলয়েশ প্রায় ছুটে গেল ওর ঝোলাটার দিকে।

'রঙিন তরলটা নিশ্চয়ই পয়জন।' মেরুন অস্ফুটে বলল।

'আই থিঙ্ক সো। কিন্তু নিজে খেয়েছে, না জোর করে খাইয়ে দিয়েছে, দেয়ার লাইজ দ্য ট্রুথ।'

মেরুনের ফোনটা ভাইব্রেট করতে শুরু করেছে।

'আগের নাম্বারটা! সিতির ছোটমাসি। কী বলব প্রলয়েশদা?'

প্রলয়েশ খিঁচিয়ে উঠল, 'বল, পৌঁছে যাচ্ছি। অনেকটা দূরে আছি।...যত্তসব স্পুন-ফেড বেবি!'

মেরুন ফোনটা হাতে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রলয়েশ ঝোলা থেকে পকেট ডায়েরির মতো একটা কালো মলাটের বই বের করে ফেলেছে। পাতা উলটে যাচ্ছে আর বিড়বিড় করছে।

'এই তো! প্রেতযোনি লগ্ন। সাতটা আটচল্লিশ। মাই গড্! অনলি ফাইভ মিনিট্স লেফ্ট।'

বইটা ঝোলায় ঢুকিয়ে একটানে কালো বোতলটা বের করে আনল। ছিপি খুলে ঢকঢক করে অনেকটা গলায় ঢেলে দিল।

'এ কী প্রলয়েশদা! একেবারে র খাচ্ছ!' মেঘনা বলল।

'স্টপ্ ইট। আমায় আমার কাজ করতে দে।' প্রলয়েশকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। চোখ-মুখ-গলা পালটে গেছে।

'তুই, চিন্নি থালাটা ক্লিন করে ফ্যাল। সিদ্ধেশ, মুড়ির বাটি-টাটি সব ঘর থেকে হাটা। মেরুন, ধূপগুলো ধর। অ্যাশট্রেতে গুঁজে দে।...সময় নেই, সময় নেই!'

প্রলয়েশের এক হাতে সিঁদুরের কৌটো, ফুলের কিছু পাপড়ি—অন্য হাতে অবিকল আগের মতন দেখতে একটা তেলেভেজানো কালচে পুতুল।

মেরুন বলল, 'প্রলয়েশদা। তোমার কাছে আরেক সেট ছিল?'

'অলওয়েজ থাকে।' প্রলয়েশ থালায় সিঁদুর লেপতে-লেপতে বলল, 'রাখতেই হয়। নে, বসে পড়্। আর মাত্র দু-মিনিট।'

থালার ওপর পাপড়ি ছড়াচ্ছে, পুতুলটা শোয়াল মাঝখানে। ঘরের চারিদিকে চোখ বুলোচ্ছে। হাওয়া আড়াল করে ধূপগুলো জ্বালিয়ে দিল।

বাইরে বৃষ্টির ঝুপঝুপ শোনা যাচ্ছে না। শুধু পুরোনো পাখাটার কিচ্‌কিচ্।

'ফ্যানটা অফ করে দিচ্ছি। ডিসটার্বিং সাউন্ড। সবাই আগেরমতো পাশেরজনকে ছুঁয়ে থাক। মেরুন। তুই পেনসিল ধর।'

'আ-আমি?' মেরুনের কথা কেঁপে গেল।

'ইয়েস! য়ু। তুই সিতির সবচেয়ে ক্লোজ ছিলি। লেট্স স্টার্ট।'

ঘর অন্ধকার। শব্দহীন।

প্রলয়েশ এসে বসে পড়েছে মেরুন আর সিদ্ধেশের মাঝের চেয়ারে।

তারপর দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে পুতুলটায় আগুন ধরিয়ে দিল।

পুতুলটা জ্বলছে। অন্ধকার দেওয়ালে ছায়ারা নাচছে।

ধূপ আর পুতুলপোড়া মিলেমিশে ঘরময় শ্মশানের কটু গন্ধ।

'আমার চোখের দিকে তাকাও সবাই। দ্যাখো! কী দেখছ?' প্রলয়েশের চোখের মণিদুটো এইমুহূর্তে অস্বাভাবিক বড়। শ্বাপদের মতো সবুজ আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। মণিদুটোর মধ্যে জ্বলন্ত পুতুলটা!

'টেন...নাইন...এইট...সেভেন...সিক্স...ফাইভ...'

প্রলয়েশের গলা গমগম করছে।

'ভাবো তোমরা...সিতি...সুইট সিতি...তোর কী কষ্ট...সিতি...আয়... আয়...!'

হঠাৎ মেরুনরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট! জ্বলন্ত পুতুলটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার গা দিয়ে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে।

'সিতি...সিতি...সিতি!...এসেছিস?'

মেরুনের হাত থেকে পেনসিলটা ছিটকে পড়ল। মেরুনের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

'সিতি...! সিতি...! পেনসিলটা পড়ে গেছে। কী করে জানব তোর কথা?'

'আ-মি...ব...ল...ব!'

মেরুনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। অচেনা স্বর। তার চোখদুটো তন্দ্রাচ্ছন্ন।

দেওয়ালের লালচে ছায়াদের মধ্যে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা অবয়ব। অবয়ব ভেঙেচুরে যাচ্ছে।...তবুও চেনা-চেনা লাগছে।

কে ও? সিতি? নাকি কোনও অনাহূত অতিথি? না চোখের ভুল?

৩

ম্যাথস টিউশন থেকে ফিরে কোনওরকমে ব্যাগটা সোফার উপর ছুড়ে ফেলল অর্ক।—জোর বৃষ্টি হচ্ছে। চুল ভিজে, জামা-প্যান্ট ভিজে। কিন্তু তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই অর্কর। এখন ও বাড়িতে একা, মা আসতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি আছে।

মা একটা সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তবে রবিবারে বাড়িতেই থাকে। আজ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

অর্কর বাবা মারা গেছেন বছর তিনেক হল। ক্যান্সারে। একদম শেষের দিকে ধরা পড়েছিল। তখন আর চিকিৎসার উপায় ছিল না। তখন থেকেই ওদের ছোট পরিবারটা আরও ছোট হয়ে গেছে। অর্ক আর অর্কর মা।

আগে ফুটবল খেলতে ভালোবাসত অর্ক। স্কুল থেকে ফিরে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে ওর বয়সি চার-পাঁচজন বন্ধু মিলে ফুটবল খেলত।

এখন বাড়িতে কম্পিউটারটা আসার পর থেকে ফুটবল আর ওর খেলতে ইচ্ছে করে না। সময় পেলেই কম্পিউটারে গেমস আর ফেসবুকে চ্যাট করতে বসে যায়।

এখন অর্কর বেশিরভাগ বন্ধুই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের। ফেসবুকের। মা বাড়িতে থাকলে নানারকম বাধানিষেধ এসে যায়। কম্পিউটারে খেলা চলবে না। চ্যাট করা চলবে না। দু-ঘণ্টা অঙ্ক, এক ঘণ্টা ইংরেজি, আধঘণ্টা সায়েন্স—আরও নানান রুটিন।

তাই মা না থাকলেই অর্ক একটা বাড়তি স্বাধীনতা পেয়ে যায়। ঠিক যেমন এখনকার এই দেড় ঘণ্টাটা। অর্কর একেবারে নিজস্ব। সব হিসেবের বাইরে।

কম্পিউটার অন করে ফেসবুকে ঢুকতে অর্কর ঠিক চার মিনিট লাগল। আজকে একটা বিশেষ দিন। আগে থেকেই ওকে বলা ছিল

ঠিক এই সময়েই ফেসবুকে ঢুকতে। তাই বাস থেকে নেমে বৃষ্টির পরোয়া না করে তার মধ্যেই একছুটে বাড়ি ঢুকেছে ও। লাভও হয়েছে। সময়ের পাঁচমিনিট আগে পৌঁছেছে। লগ ইন করে চট্‌ করে ও একবার দেখে নিল রক্তিমদা অনলাইন আছে কিনা—অনলাইন।

রক্তিমদার মেসেজ বক্সে গিয়ে ও টাইপ করল ৩৫২১। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওর ইনবক্সে রিপ্লাই এল ৫৭৪৩। ওর আর রক্তিমদার মধ্যে যে-কোনও কথোপকথন শুরুর আগে এটাই ওদের গোপনীয় কোড। যাতে দু-পক্ষই নিশ্চিত হয় যে ওরা ছাড়া অন্য কেউ লগ ইন করে বসে নেই।

অন্য কেউ না জানলেও রক্তিমদার আসল পরিচয়টা অর্ক জানে। প্রথম আলাপের একসপ্তাহ পরে বিশ্বাস করে অর্ককে ওর আসল পরিচয়টা দিয়েছিল রক্তিমদা। রক্তিম আছে RAW-তে। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইঙ্গ। সবার চোখের আড়ালে থেকে ভারতকে টেররিস্ট হানার হাত থেকে বাঁচানোর কাজটা ওরা করে যায়।

এই তো কয়েকদিন আগের কথা। রাঁচিতে আইপিএল-এ কেকেআর ভার্সেস রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স-এর খেলা ছিল। কেকেআর জিতেছিল ন'উইকেটে।

খেলা দেখা, নাচ গান আনন্দের মধ্যে দর্শকরা কেউ জানতেই পারল না যে সেদিন তাদের জীবন অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল। শুধু রক্তিমদার জন্য। আরেকটু হলেই দুজন জঙ্গি ঢুকে পড়ত খেলার মাঠে। ভিভিআইপি বক্সের ঠিক নীচেই বসত ওরা। আর খেলা শুরুর ঠিক একঘণ্টার মধ্যেই বিস্ফোরণ হত। কত লোক যে মারা যেত! ভাবলেই ভয় লাগে অর্কর।

খবরটা জানার পর অর্ক অবাক হয়ে রক্তিমদাকে জিগ্যেস করেছিল 'আচ্ছা, এত বড় একটা কাজ করলে, অথচ তোমার কাজ কেউ জানল না, তোমার কষ্ট হয় না? তোমার তো অন্তত একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, একটা রেকগনিশন।'

রক্তিম একটা স্মাইলি পাঠিয়ে বলেছিল, 'এটাই তো আমার কাজ। ভারত-ই আমার সবকিছু। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমার দেশকে

বাঁচিয়ে যাব। আমার কাজটাই এরকম। কখনও সবার সামনে আসা চলবে না। হাততালির জন্য এ কাজ নয়।’

সেদিন থেকেই অর্ক ওর ফ্যান। রক্তিমও মাঝেমধ্যেই ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা অর্কর সঙ্গে শেয়ার করে। আর করবে নাই-বা কেন! অর্ক তো আর খারাপ ছেলে নয়। ওর কাছেও দেশই সবকিছু।

মেসেজ এসে গেছে, তোমাকে যা বলেছিলাম সে-কাজের জন্য তুমি রেডি তো!

—হ্যাঁ, রেডি।

—খুব ভালো। মনে রাখবে, তুমি হলে সৈনিক। দেশের জন্য যে-কোনও আত্মদানে প্রস্তুত এক সৈনিক। তোমাকে যা যা বলব তা কাউকে বলা চলবে না। মা জিগ্যেস করলেও না। ঠিক তো?

—ঠিক।

—এবার মন দিয়ে শোনো। কালকে ক্যুরিয়ারে তুমি যে ব্যাগটা পেয়েছিলে তখন খুলতে বারণ করেছিলাম। আজ খুলো। সেটা খুললে তার মধ্যে একটা ছোট ওষুধের শিশি পাবে। তোমাদের নীচের ফ্ল্যাট 3F-এ যে দিদি এসেছে তাকে ওটা দিতে হবে। সিতি স্যান্যাল। চেনো নিশ্চয়ই!

—সিতিদি! হ্যাঁ ভালোভাবেই চিনি। এটাই কাজ! দ্যাট্‌স অল?

—ওয়েট! ব্যাপারটা ওকে কোনওভাবে জানতে দেওয়া চলবে না। ও ঠিক এরকম একটা শিশিতে রাখা ওষুধ খায়। সেটা থাকে ডাইনিং টেবিলের উপরে। সেটা সরিয়ে সেখানে এটা রেখে দিতে হবে। আর আগের ওষুধটা নিয়ে চলে আসবে। ও.কে.?

—কিন্তু কেন? অর্ক একটু অবাক হয়।

—এটাই তো প্রবলেম। সব কথা বলা যায় না। RAW-তে এটাই নিয়ম। শুধু জেনে রেখো যে তুমি সিতিদিকে কিছুই চেনো না। যতটা ভালোমানুষ মনে হয়, ততটা নয়।

—ইজ শি আ টেররিস্ট?

—হুম্। এটুকুই বলব সে আমাদের দেশের এনিমি।



—আশ্চর্য! এটা ঠিক, কারুর সঙ্গে খুব একটা মেশে না। কথাও কম বলে। কিন্তু পড়াশোনায় কত ভালো। তা কাজটা আমি করব কী করে?

—খুব সিম্পল। ফ্রিজে কিছু খাবার আছে?

—হ্যাঁ, সে তো আছেই। সবসময় থাকে।

—ব্যস, যে-কোনও একটা খাবার নিয়ে তুমি সিতিদির ফ্ল্যাটে যাবে। বেল বাজাবে। শি নোজ ইউ ওয়েল। দরজা খুললে খাবারটা দিয়ে বলবে মা পাঠিয়েছে। পাত্রটা ফেরত চাইবে, ও.কে.?

—ও.কে.।

—আর যখন ও খাবারটা রাখতে ভিতরে যাবে তখনই এই ওষুধের শিশিটা পালটে দেবে। কী পারবে তো?

—পারব। আমার সঙ্গে সিতিদির ভালো আলাপ আছে।

—গুড। তুমি তো বেশ ইনটেলিজেন্ট। এনি কোয়েশ্চেন?

—ওষুধের শিশিটা যদি ভর্তি না থাকে, তা হলে সিতিদি এই নতুন শিশিটা দেখে ধরে ফেলবে না তো?

—গুড কোয়েশ্চেন। কাল দুপুরে ওই শিশিতে ঠিক যতটা ওষুধ ছিল ঠিক ততটাই আছে এই শিশিতে। যেটা তুমি পেয়েছ।

—কী করে জানলে? তুমি কি সিতিদিকে চেনো?

—RAW অনেক খবর রাখে। তবে আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। চিনে ফেলবে। তাই তোমাকে দিচ্ছি।

—ঘরে যদি না থাকে?

—ঘরেই আছে। একা আছে। তবে দেড় ঘণ্টা পরে বেরোবে। কাজটা তাড়াতাড়ি করো। নেক্সট ফাইভ মিনিটে।

আবার মেসেজ আসে, আরেকটা কথা। আমার আর তোমার পুরো চ্যাটটা ডিলিট করে দিও। কেউ যেন কখনও জানতে না পারে এসব কথা। ও.কে.?

—ও.কে.।

—ধরো, যে-কোনও কারণে শিশিটা পালটাতে পারলে না। ডোন্ট প্যানিক। জাস্ট এই শিশিটা নিয়ে ফিরে এসো।

কোনও রেসপন্স না দেখে আবার মেসেজ আসে রক্তিমের তরফ থেকে।

—আর ইউ নার্ভাস?

—একটু।

—একটু নার্ভাসনেস ভালো। কাজটা তাতে পারফেক্ট হয়।

—ওটা কি পয়জন?

—বলা যাবে না। বাট ডোন্ট ওরি। তুমি তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট-এর হয়ে কাজ করছ। আই অ্যাম দেয়ার ফর ইউ। ইউ উইল গেট অল প্রোটেকশান। প্ল্যান ফর ইট। প্রত্যেকটা মুভমেন্ট ভেবে রেখো। ইউ হ্যাভ ফাইভ মিনিট অনলি।

—কীরকম প্ল্যান রক্তিমদা?

ফের মেসেজ আসে, ঢোকার সময় কেউ যেন না দেখে। তোমার সঙ্গে কেউ যেন না ঢোকে...এইসব। সেরকম ক্ষেত্রে মিশন ক্যানসেল।

আরও কিছুক্ষণ বাদে অর্কর সঙ্গে চ্যাটটা অফ করে রক্তিম। অর্ক ক্লাস টেন-এ পড়ে। বুদ্ধিমান ছেলে। তবু টেনশন হয়। পারবে তো?

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় রক্তিম। মোবাইল বের করে একটা নাম্বারে ফোন করে।

—কাজ হয়ে যাবে। অর্ককে বুঝিয়ে দিয়েছি।

—একদম ক্লিয়ার তো?

—একদম বস্‌। চিন্তা কোরো না।

—আচ্ছা, একটা কথা বলো তো! তুমি শিওর যে সিতি ব্যাপারটা জেনে গেছে?

—হ্যাঁ, আমি শিওর। ও দেখেছিল। আমি চেকও করেছিলাম। কনফার্মড। ওর মুখ বন্ধ করার এটাই একমাত্র উপায়।

—হ্যাঁ, তাহলে তো আর উপায় নেই। ওর নিয়তিতে মৃত্যু লেখা। অর্ক ছেলেটা আবার পরে কোনও কথা বলে দেবে না তো?

—না, ও জানে আমি RAW-তে আছি। ও দেশের জন্যে কাজ করছে। আর বলবেটাই বা কী? আমার ফেসবুকের প্রোফাইলটাই তো ফেক। আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে যাতে ট্রেস করতে না পারে তার

ব্যবস্থাও করেছি।

—ও.কে., গুড জব। দেখা যাক কী হয়।

—ও হ্যাঁ। বলে রাখি। ছেলেটা আমাকে রক্তিম বলে জানে।

—ভালো, ভালো। জেন্ডারও চেঞ্জ করে নিয়েছ ফেসবুকে। বুদ্ধি আছে দেখছি।

রক্তিম মুচকি হাসল। তারপরে বলে ওঠে, যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরোতে হবে।

ফোনটা ছেড়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে রক্তিম ঠোঁটে লিপস্টিক বোলাতে থাকে। তাড়াতাড়ি রেডি হতে হবে। জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া পুরো বারান্দা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তবু তার মধ্যেই বেরোতে হবে।

ঘটনা যখন ঘটবে, রক্তিম তখন ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে। তা ছাড়া শিশিতে হাতের ছাপও ওর থাকবে না।

বৃষ্টির ছাটের দিকে তাকিয়ে আরেকবার হাসল রক্তিম। প্রকৃতিও সঙ্গে আছে। এই বৃষ্টিতে চট করে কেউ সিতির ফ্ল্যাটে আসবে না। অর্ক নিশ্চিন্তে কাজ সারতে পারবে।

জানলার কাচে ওর কোমর অব্দি নেমে আসা চুলটাকে কেয়ারফুলি দেখল রক্তিম। ওকে দেখে কি খুনি মনে হতে পারে? কখনোই না! তবে একটাই মুশকিল। ওকে যে একবার দ্যাখে, চট করে সে ভোলে না। একটু কম সুন্দরী হলে ভালো হত।

৪

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি। কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক। তারপর কী যেন? মেঘলা দিনে দেখেছিলাম পথে...।

পথে? না মাঠে?...মাঠেই হবে বোধ হয়...কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।

একটু আগে অবধি বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনের ওই চাতালটায় শুয়ে

ছিল আমার কৃষ্ণকলি। দুটোমাত্র তুলসীপাতাতে টানা টানা চোখদুটোকে পুরোপুরি ঢাকা যায় কখনও? সাদা চাদরের নীচে শরীর তখনও একই রকম দিঘল। কপাল আর গালের ত্বক থেকে তখনও পালিশ করা মেহগনি কাঠের মতন আলো ঠিকরোচ্ছে। অবাক হয়ে দেখছিলাম, মৃত্যু অথবা বিষের জ্বালা কিংবা মর্গের কাটাছেঁড়া, কিছুই ওর রূপের ওপর থাবা বসাতে পারেনি।

প্রলয়েশদা কালীবাড়ির পাশের ফুলের দোকান থেকে একটা রক্তজবার মালা কিনে এনে ওর মাথা আর মুখের চারপাশে জড়িয়ে দিয়েছিল। তখন আর কৃষ্ণকলি নয়, ওই মালাটার জন্যেই ওকে মনে হচ্ছিল হাওয়াই দ্বীপের এক নর্তকী। নাচের ফাঁকে অল্প বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। একটু বাদেই উঠে দাঁড়াবে, ঘাসের ঘাঘরা দুলিয়ে নেচে উঠবে তুমুল 'হুলা' ড্যান্স।

আরে ধুর। তাই কখনও হয়? ওর টার্ন আসতেই চুল্লির দরজাদুটো খুলে গেল। খরখরে লোহার হ্যান্ডেলের এক মোচড়ে নর্তকীর শরীরটা ঢুকে গেল চুল্লির মধ্যে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেলাম, ফার্নেসের আগুনে দপ দপ করে জ্বলে উঠল সিতির গুছি করে বাঁধা চুল।

ব্যস। আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল চুল্লির দরজা। এবার পঁয়তাল্লিশ মিনিটের প্রতীক্ষা। তারপর শ্মশানচণ্ডাল একটা মাটির সরায় করে একমুঠো অস্থি আর ভস্ম আমাদের হাতে তুলে দেবে। ব্যস, সব শেষ। ফিনিশড্। ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ। ভাবলেই হাসি পায়। এতটুকু আয়ুর জন্যে এত মান-অভিমান! এত ঘমন্ড্! এত অ্যাডিকশন! এর জন্যেই ওয়ান রুম ফ্ল্যাটে একলা বাঁচা!

সিতি, সিতি, তুই যদি জানতিস তোর আয়ু পঁচিশের ওপারে যাবে না, তা হলেও কি এইভাবেই জীবন কাটাতিস? তা হলেও কি তুই মরার আগে তিন তিনবার আমার ফোন কেটে দিতিস?

মেরুন! এই মেরুন! কী হয়েছে তোর? কী বিড়বিড় করছিস? মুখটা তোল। চল একটু গঙ্গার দিকটায় গিয়ে দাঁড়াই। গুমোট লাগছে

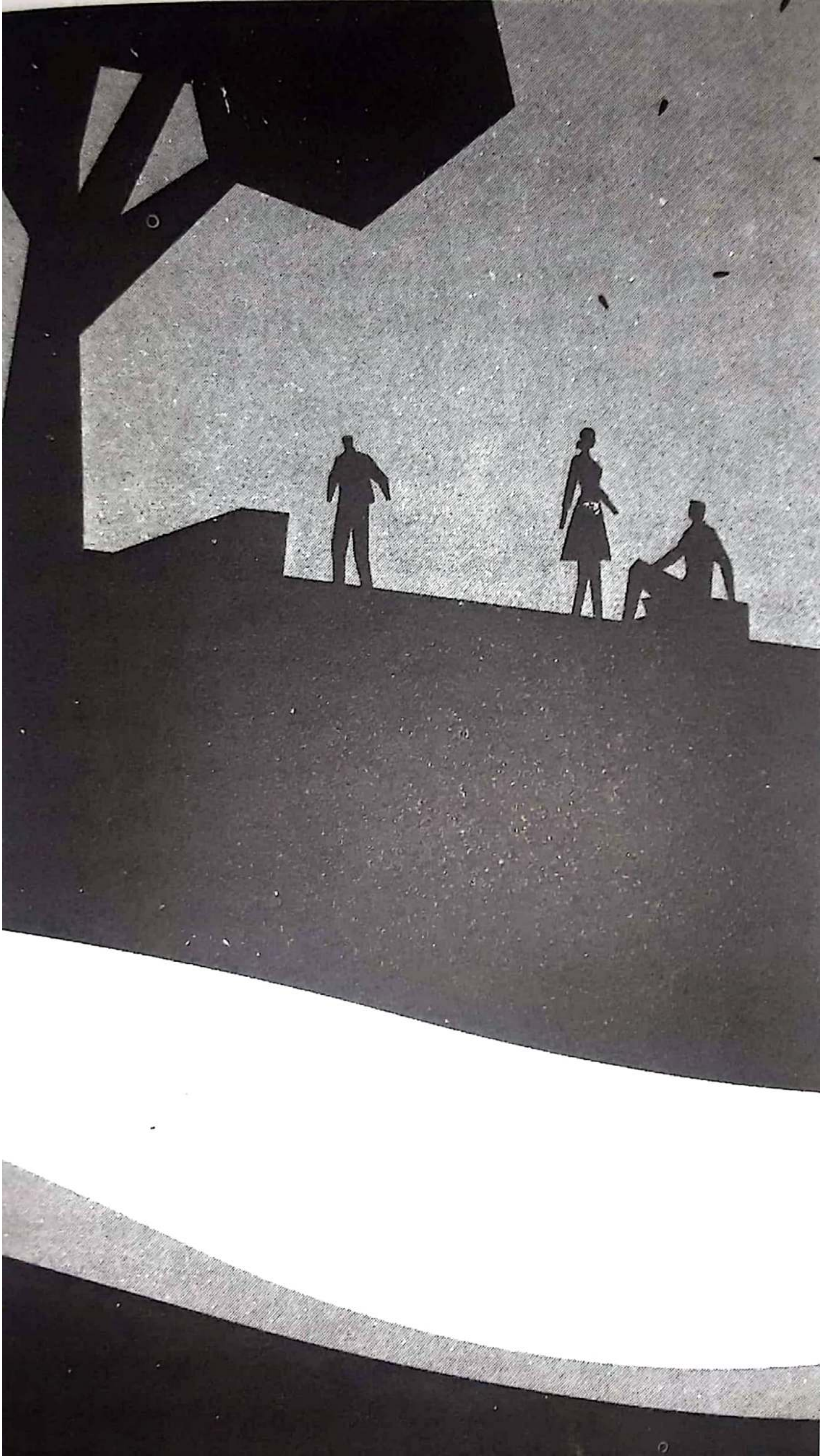
খুব।—সিদ্ধেশ একটা ঠ্যালা দিল পাশে বসে থাকা মেরুনকে। মেরুন অনেকক্ষণ ধরে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসেছিল। সিদ্ধেশের ধাক্কায় মুখ তুলে তাকাল। সিদ্ধেশ দেখল ওর চোখদুটো করমচার মতন লাল।

যাবি? চল।—বেশ বাধ্য ছেলের মতন উঠে দাঁড়াল মেরুন। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিল সিদ্ধেশের দিকে। সিদ্ধেশ একটু ইতস্তত করে মেরুনের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল। একটা সাপোর্ট থাকলে উঠে দাঁড়াতে সুবিধে হয় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে ওর মনের ভেতর কেমন যেন একটা তেঁতোভাব ছড়িয়ে যায়। মনে হয়, যে সাপোর্টটা দিল, সে একইসঙ্গে ওর ওই কমজোরি পা-টার জন্যে ওকে একটু করুণাও দ্যাখাল। সিদ্ধেশ জানে, মেরুন ওরকম নয়। ওর চেহারার মতন ওর দিলটাও বেশ বড়। দিলটা বড় বলেই এত কষ্ট পাচ্ছে। নাহলে সিতি ওর কে? কোনও স্টেডি অ্যাফেয়ার তো ছিল না দুজনের মধ্যে।

সিদ্ধেশ আর মেরুন ঘাটের চওড়া সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে জলের কাছাকাছি নেমে এল। ভাদ্রমাসের বৃষ্টি; এই তেড়েফুড়ে আসছে, এই থেমে যাচ্ছে। এখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে রয়েছে। এখানে তবু একটু হাওয়া আছে। একটু আরাম। ওরা দুজনেই ঝুঁকে পড়ে আঁজলা ভরে জল তুলে চোখে-মুখে ছেটাল। তারপর ঘাটের সিঁড়িতে বসে সিদ্ধেশ মেরুনকে বলল, সকাল থেকে এই পর্যন্ত যা যা ঘটে গেল, ভাবতে গেলে মাথার ভেতরটা কেমন চক্কর কাটছে, বুঝলি? মনে হচ্ছে একটা হ্যালুসিনেশনের মধ্যে রয়েছি। কিছুই সত্যি নয়।

মেরুন সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে হঠাৎ সিদ্ধেশকে জিগ্যেস করল, দ্বিতীয়বার প্ল্যানচেটের সময় কী হয়েছিল রে? আমার যখন হুঁশ ফিরল তখন দেখলাম তোরা সবাই কেমন যেন হিপনোটাইজড হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছিস। চিন্নি তো রীতিমতন থরথর করে কাঁপছিল। আমি কি কিছু বাওয়াল করেছিলাম?

যাঃ, বাওয়াল বলছিস কেন?—সিদ্ধেশ জোরগলায় প্রতিবাদ করে



উঠল। যা হয়েছিল সেটা আমার কাছে অন্তত কোয়াইট সুপারন্যাচারাল এক্সপেরিয়েন্স।

একটু বলবি ঠিক কী হয়েছিল?

দ্যাখ মেরুন, সোজা বাংলায় বলতে গেলে তোর ওপরে সিতির আত্মা ভর করেছিল। তুই সিতির গলায় কথা বলছিলিস। তুই বলতে যাচ্ছিলিস সিতি কেমনভাবে খুন হয়েছিল। কিন্তু ঠিক তখনই...।

হ্যাঁ, তখন কী হয়েছিল? বলতে যে পারিনি সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন?

ঠিক তখনই চিন্নি চিৎকার করে উঠেছিল। তার পরেই হাতের এক ঝটকায় সিয়াঁসের সব মেটিরিয়ালগুলোকে—মানে ওই জ্বলন্ত পুতুল, ফুল, প্ল্যানচেট-বোর্ড—সমস্ত কিছু টেবিল থেকে ছুড়ে ফেলে দিল। বিশ্বাস কর, তুই তখন অবিকল সিতির গলায় তীব্র তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে উঠেছিলিস। তারপর তুই চেয়ার থেকে আছড়ে পড়লি মেঝেতে। প্রচণ্ড হাত-পা খিঁচোচ্ছিলিস তুই। প্রলয়েশদার তখনকার মূর্তি যদি তুই দেখতিস মেরুন! কী অদ্ভুত একটা মন্ত্র কী আশ্চর্য সুরে পড়ে যাচ্ছিল আর দু-হাত তুলে তোর শরীরটাকে ঘিরে কনস্ট্যান্ট ঘুরপাক খাচ্ছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, প্রলয়েশদা কারুর কাছ থেকে তোকে আগলে রাখছে। তোর প্রাণটাকে।

মেরুন এতক্ষণ চুপ করে সিদ্ধেশের কথা শুনছিল। এবার প্রশ্ন করল, কিন্তু চিন্নি ওরকম করল কেন? কেন সিয়াঁসটাকে নষ্ট করল? ডিড শি অফার এনি এক্সপ্ল্যানেশন?

বলছে তো, ও নাকি আর সহ্য করতে পারেনি। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়ে ওরকম করে ফেলেছে। ওকে খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না। তোর গলা থেকে ওইভাবে ...ওঃ, বলতে গিয়ে আমারই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

মেরুন কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর নিজের মনেই বলল, আজ দুপুরে তোদের বাড়িতে আমরা সবাই ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। শুধু মেঘনা দেরি করেছিল।

হ্যাঁ, করেছিল। তো?

জিগ্যেস করেছিলিস, কেন?

একটা মেয়ের কাছে এভাবে কথায় কথায় জবাবদিহি চাওয়া যায় নাকি? হতে পারে ওর কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল।

মেরুন গম্ভীর মুখে বলল, হতে পারে। না-ও হতে পারে।

আবার কিছুক্ষণ ওরা দুজনেই চুপ করে নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মেরুন বলল, সিদ্ধেশ, তোকে একটা কথা বলি। কথাটা এতদিন কাউকেই বলিনি। তুই বিশ্বাস করবি কি না জানি না। সিতি গত কয়েকমাসে কয়েকবারই আমার কাছে টাকা ধার চেয়েছিল। খুব বড় অ্যামাউন্ট কিছু না। এই ধর পাঁচশো-হাজার করে।

কথাটা শুনে সিদ্ধেশ চমকে উঠল। মেরুনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী বলছিস তুই? সিতি তো শুনেছি অনেক রোজগার করছিল। বই বিক্রির টাকায় ফ্ল্যাট কিনল। তার পরেও ধার করছিল কেন? কারণটা জানতে চাসনি?

তোর উত্তরটাই তোকে ফিরিয়ে দিই? একটা মেয়ের কাছে এভাবে কথায় কথায় জবাবদিহি চাওয়া যায় নাকি?

মেরুন কথাটা বলেই সিদ্ধেশের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিল কথাটা ও হালকা চালেই বলেছে। তারপর বলল, আমি সত্যিই ওকে কখনও জিগ্যেস করিনি রে সিদ্ধেশ। ও নিজেই দু-একবার কী সব যেন এক্সকিউজ দিয়েছিল। চেকবই ফুরিয়ে গেছে, ক্রেডিট কার্ড এক্সপায়ার করে গেছে—এইসব। কোনওটাই তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তোর কী মনে হয় মেরুন? সত্যি কারণটা কী হতে পারে?

আমার মনে হয় সিতি ওয়াজ বিয়িং ব্ল্যাকমেইলড। কেউ ওর কোনও গোপন কথা জেনে ফেলেছিল। তারপর ওকে নিংড়ে টাকা আদায় করছিল।

সিতিকে কে ব্ল্যাকমেইল করবে? ও তো ভীষণই চাপা স্বভাবের মেয়ে ছিল। ওর যদি সেরকম কোনও সিক্রেট থেকেও থাকে, কে

জানবে বল তো সেকথা?

নামটা বলব? তুই হজম করতে পারবি তো?—জিগ্যেস করল মেরুন।

—তুই বল।

প্রলয়েশদা। সিতি বেশ কয়েকবার প্রলয়েশদাকে মিট করেছিল, প্রফেশনাল হেল্পের জন্যে। ইন ফ্যাক্ট আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু সিক্রেট ওই লোকটা জানে।

মেরুন: সিদ্ধেশ চাপা গর্জন করে উঠল। তুই কী বলছিস তুই নিজেই জানিস না। প্রলয়েশদা আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ও একজন সাধক। ওর সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আছে। আজকের সিয়াঁস তুই নিজেই দেখেছিস।

দাঁড়া, দাঁড়া। উত্তেজিত হোস না। হ্যাঁ, আজকের দুটো সিয়াঁসের প্রথমটা আমি দেখেছি। সেখানে প্রলয়েশদা নিজেই মিডিয়াম হয়েছিল। ও যা করেছিল সেটা একটু অভিনয় জানা কোনও লোকের পক্ষে করা একদমই কঠিন নয়।

সিদ্ধেশ তেঁতো গলায় বলল, দ্বিতীয়বারে তুই নিজেই মিডিয়াম হয়েছিলিস। তুই একটা ঘোরের মধ্যে ছিলিস বলে তুই জানিস না কী হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি।

সিদ্ধেশ, প্লিজ কাম ডাউন। প্লিজ। আমি কয়েকটা পসিবিলিটির কথা বলছি শুধু। মে বি আই অ্যাম রং। কিন্তু...আচ্ছা, একটা ব্যাপার তুই খেয়াল করেছিলিস? ওই মোমের পুতুলটায় আগুন ধরানোমাত্র একটা মিষ্টি গন্ধে ঘরটা ভরে যাচ্ছিল। দ্বিতীয়বারে এই পুতুলটাকে প্রলয়েশদা বসিয়েছিল একেবারে আমার মুখের কাছে। কাজেই প্রায় পুরো ধোঁয়াটাই আমি ইনহেল করেছিলাম। ব্যস, ওইটুকুই মনে আছে। তারপরেই আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। ইয়েস, ভর-টর কিছু নয়। আই ওয়াজ ড্রাগড। উই ওয়্যার ড্রাগড, আমি বেশি, তোরা কম। আমাদের সকলেরই বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তুই হ্যালুসিনেশনের কথা বলছিলিস না একটু আগে? সত্যিকারেই আমরা হ্যালুসিনেশন দেখেছিলাম। দেওয়ালে চলন্ত

ছায়া। আর কীভাবে এর ব্যাখ্যা সম্ভব, বল।

আর তোর গলা থেকে মেয়েদের গলায় কথা? সেটাও কি হ্যালুসিনেশন?

না, ভেন্ট্রিলোকুইজম। স্বরক্ষেপণ। মেলায় কথা বলা পুতুলের খেলা দেখেছিস? সত্যিকারেই কি পুতুল কথা বলে? না। পুতুলটাকে কোলে নিয়ে বসে থাকে যে লোকটা সে একজন ভেন্ট্রিলোকুইস্ট। সে নিজের গলার স্বর এমনভাবে থ্রো করে যে মনে হয় শব্দগুলো পুতুলটার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে।

তার মানে?

তার মানে, আমি জ্ঞান হারানোর পরে প্রলয়েশদা আমার মুখ দিয়ে সিতির গলায় কথা বলেছিল। আমি প্রলয়েশদাকে তোদের অনেক আগে থেকে চিনি। ওর অনেকগুলো গুণের মধ্যে একটা হল ও একজন ভালো ভেন্ট্রিলোকুইস্ট।

সিদ্ধেশ বেশ কয়েক মিনিট দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে রইল। তারপর বলল, কিন্তু মোটিভটা কী। তোর কথাই মেনে নিচ্ছি। ও একজন জোচ্চোর। ও তোর মুখ দিয়ে একটা নাম বলাত। আমরা সবাই বিশ্বাস করে নিতাম সেই লোকটাই খুনি। কিন্তু তাতে কী লাভ হত?

কেন? সত্যিকারে যে সিতিকে খুন করেছে তার দিক থেকে আমাদের নজর ঘুরে যেত। তোর মনে আছে তো, কেউ কিছু জিগ্যেস করেনি, তবু প্রলয়েশদা খুব তাড়াহুড়ো করে অলরেডি খুনির চেহারার একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছে। কী যেন? গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, চোখে চশমা, মাঝবয়েসি লোক। ওরকম কোনও লোক সত্যিই আছে যাকে ফাঁসানো হবে। প্রলয়েশদাই ফাঁসাবে। তুই দেখে নিস।

সিদ্ধেশ কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ঠিক ওদের পেছনে এসে কেউ দাঁড়াল। ওরা দুজনেরই চমকে ঘাড় ফেরাল। দেখল চিন্নি কখন

যেন ওদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছে। খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে চিন্নি ওদের পাশে ধপ করে বসে বলল, আর পারছি না রে। আমার মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে।

সিদ্ধেশ আর মেরুন দুজনেই মায়াভরা চোখে চিন্নির দিকে তাকাল। চিন্নি ওদের মধ্যে সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে নিরীহ। সবচেয়ে ফুর্তিবাজও বটে। ওর সঙ্গে কারুর ঝগড়া নেই। পরিবেশ গম্ভীর হয়ে গেলে ছোট্টখাট্টো চেহারার চিন্ময়ী সরকার আস্তে করে সেখান থেকে কেটে পড়ে। কখনোই গোলমালে জড়ায় না।

এই নরম-সরম মেয়েটাও আজ বন্ধুত্বের টানে নিমতলা শ্মশানের মতন কঠিন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমন একটা জায়গা, হাজার মার্কারি ল্যাম্পের আলোও যেখানকার সব অন্ধকার সরাতে পারে না। এক কোটি ধূপ আর অগুরুর গন্ধেও যেখানকার হাওয়া থেকে মাংস পোড়ার গন্ধ মিলিয়ে যায় না। সেখানে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেই কপালের ঘামের সঙ্গে চিতার কাঠের পোড়া ছাই জড়িয়ে গিয়ে চিটচিটে ময়লা জমে ওঠে।

সিদ্ধেশ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, মেরুন, তোর বাকি কথাটা ফিরে এসে শুনছি।

—কোথায় যাচ্ছিস তুই?

—প্রলয়েশদার কাছে আমার ব্যাগটা আছে। ওর মধ্যে দু-একটা অ্যাসপিরিন আছে বোধহয়। চিন্নির জন্যে একটা নিয়ে আসি।

ওদের আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সিদ্ধেশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তার দিকে উঠে গেল।

সিদ্ধেশ চলে যেতেই চিন্নি তাড়াহুড়ো করে নিজের হ্যান্ডব্যাগটা হাটকাতে লাগল।

কী খুঁজছিস? জিগ্যেস করল মেরুন।

তোকে একটা জিনিস দেখাব। এ জিনিস আর কাউকে দেখানো যায় না। সিধুকে নয়, মেঘনাকে তো নয়ই। প্রলয়েশদাকেও কী জানি কেন, ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। সিতি মার্ডার হওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছে আমরা সবাই যেন প্রলয়েশদার কাছে বড্ড বেশি

নিজেদের এক্সপোজ করে ফেলেছি। ওই লোকটা আমাদের সবার দুর্বলতা জানে, লোভ জানে। হিংসের কথাও জানে নিশ্চয়ই। অন্তত আমারটা তো জানেই।

চিন্নির চিন্তা মেরুনের চিন্তার সঙ্গে মিলে গেছে। তবু তখনি কোনও মন্তব্য না করে মেরুন এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল চিন্নি ব্যাগ থেকে কী বার করে আনে।

হ্যাঁ, চিন্নি জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে। ব্যাগ থেকে একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ বার করে মেরুনের হাতে ধরিয়ে দিল চিন্নি। বলল, তাড়াতাড়ি দেখে নে। সিধু ফিরে আসার আগে ওটাকে আবার ঢুকিয়ে ফেলতে হবে।

মেরুন হাতের ভাঁজ করা কাগজটা যত্ন করে খুলল। চাঁদনির একটা বিখ্যাত কম্পিউটার মেটিরিয়ালসের দোকানের বিল। বিক্রি করা হয়েছে নর্টনের অ্যান্টি ভাইরাস সফ্টওয়্যার।

ক্রেতার নাম মেঘনা দত্ত। তারিখটা আজকের।

দুটোই বিলের ওপর লেখা আছে।

কাগজটা আবার ভাঁজ করে চিন্নির হাতে ফেরত দিয়ে মেরুন বলল, হ্যাঁ, দেখলাম। মেঘনা অ্যান্টিভাইরাস কিনেছে। তাতে কী প্রমাণিত হল?

না, মানে আমি কাগজটা যেখানে পেলাম, সেটা একটু অদ্ভুত লাগল। তাই তোকে বলছি।

কোথায় পেলি?

সিতির বাড়িতে।

মাই গুডনেস! কী বলছিস তুই। তার মানে...তার মানে মেঘনা আজকে আগে সিতির বাড়ি গিয়েছিল। তার পরে আমাদের সঙ্গে গিয়ে জয়েন করেছিল। সেইজন্যেই ওর দেরি হয়েছিল?

ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু পুলিশ সিতির ঘর সার্চ করে যে কাগজ পেল না, সে কাগজ তুই পেলি কেমন করে?

ঘরে কোথায় পেলাম? পেলাম তো সিড়ির ল্যান্ডিং-এ। খড়খড়

করে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে উড়ে বেড়াচ্ছিল। চেনা দোকানের নাম দেখে কেমন কৌতূহল হতে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। তারপর- দেখি এই কাণ্ড। সিধুকে তো এসব কথা বলা যাবে না। ওর তো মেঘনা সম্বন্ধে ভালোই টাল আছে। তাই তোকেই বললাম।

মেরুন বলল, ভালোই করলি বলে। এখন তো মনে হচ্ছে প্ল্যানচেট করে, সিতির আত্মাকে ডেকে, অত ঘুরপথে ওকে আমরা মারিনি। আরও ডাইরেক্টলি মেরেছি। আমরা সকলে না হই, কেউ কেউ। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, মেঘনা আজ এখানেও এল না। বাড়ি ফিরে গেল। কেমন করে পারল? ওর একবার ইচ্ছে করল না সিতিকে শেষ দেখা দেখতে?

এইটুকু কথাবার্তার মধ্যেই সিদ্ধেশ ওষুধ নিয়ে ফিরে এল। চিন্নির হাতে একটা ট্যাবলেট আর জলের বোতল ধরিয়ে দিয়ে সিদ্ধেশ বলল, এটা মেরে দে। একটু চোখ বুজে বসে থাকতে পারবি কোথাও? এক কাজ কর না। আমাদের গাড়িটাতেই গিয়ে বোস। কাজ শেষ হতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবেই। তার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবি।

ও.কে. বস। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ।

চিন্নি উঠে চলে গেল।

রাত একটার কলকাতা কেমন যেন অচেনা, অদ্ভুত। যে উলটোডাঙা কিংবা খান্নার মোড়ে অন্যসময় প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তা পেরোতে হয় সেখানে এখন একজনও ট্রাফিক পুলিশ নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা ট্রাক ইচ্ছেমতন এদিক থেকে ওদিক ছুটে যাচ্ছে। দু-একজন পাগল, ভবঘুরে আর মাতাল ছাড়া সেরকম কোনও পথচারীও নেই। ফুলবাগানের মোড়ের কাছে এসে ওদের বোলেরো গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিয়ে একটা সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ল। এখানেই সিতির ফ্ল্যাট। এখানেই শ্মশানযাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করছেন সিতির মাসি, মেসো,

মাসতুতো ভাই রিন্টু এবং কয়েকজন প্রতিবেশী।

সিদ্ধেশ আর মেরুন এখানে ফিরে আসার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, কী হবে প্রলয়েশদা ওখানে ফিরে? তার থেকে যে যার বাড়ি চলে যাই চলো।

প্রলয়েশ বলেছিল, যাবি, যাবি। কিন্তু তার আগে ওখানে গিয়ে আগুন আর লোহা ছুঁয়ে যা। দাঁতে নিমপাতা কাট। এইসব ব্যাপারগুলোয় একটু বিশ্বাস রাখিস, বুঝলি। তোদেরই মঙ্গল হবে।

মেরুন ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, অনেক মঙ্গল হয়েছে, আর দরকার নেই। সিদ্ধেশ আর চিন্নি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না, না, প্রলয়েশদা চলো। তুমি যখন বলছ, ফুলবাগান ঘুরেই বাড়ি যাব।

ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় সিতির ফ্ল্যাটের বারান্দায় আলো জ্বলছিল। ওর মেসোমশাই ওখানে দাঁড়িয়েই বললেন, রিন্টু গেছে দরজা খুলতে। একটু দাঁড়াও।

ওরা চারজন মেসোমশাইয়ের সেকথা যেন শুনেও শুনতে পেল না। কারণ, ওরা তখন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সিতির ফ্ল্যাটের ঠিক ওপরে তিনতলার ব্যালকনিটার দিকে। যখন সিতির মরদেহ নিয়ে রওনা হয়েছিল তখনও ওই কমবয়সি ছেলেটা ওই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল। এখন রাত দেড়টা। অন্ধকার ব্যালকনিতে একলা ছেলেটা একইভাবে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ও.কে.?

৫

অর্কর খুব ভয় লাগছে। হাত-পা শিরশির করছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে। ব্যালকনির রেলিংটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে অর্ক। তা হলে কি তার রেখে আসা শিশিটাই শেষ করে দিল সিতিদিকে? রক্তিমদা বলেছে সিতিদি টেররিস্ট। অর্ক কাজটা করলে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তাকে প্রোটেকশন

দেবে। কিন্তু তা বলে কি সে একটা মানুষকে খুন করতে পারে? আরও একটা ব্যাপারে প্রশ্নচিহ্ন উঁকি দিচ্ছে তার মনে। মিডিয়ায় ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে। টিভির খবরে বলল, সরকারের তরফ থেকে CID তদন্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সিতিদি যে টেররিস্ট তা কি সরকারের জানা নেই? যদি ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অন্যরকম কিছু হয়? যদি সিতিদি টেররিস্ট না হয়?

অর্ক এসব ভাবনার মধ্যে নিজেকে মাঝে মাঝে বোঝাবার চেষ্টা করছে এই বলে যে, 'না, না, তা হতে পারে না। রক্তিমদা নিশ্চয়ই তাকে মিথ্যা বলবে না। তার সঙ্গে কতদিন চ্যাটবক্সে কত কথা হয়েছে রক্তিমদার। তারপরই তো সে রক্তিমদাকে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু তবুও প্রশ্নগুলো তার মনে ঘুরে ফিরে আসছে। বেশ কয়েকবার ফেসবুক খুলেছিল সে। কিন্তু রক্তিমদাকে সে পায়নি। যদি রক্তিমদাকে একবার পাওয়া যেত, তবে তার সঙ্গে কথা বললে হয়তো মনটা শান্ত হত। ফেসবুক পেজে তার অ্যাড্রেসের জায়গাতে কোনও কিছু লেখা নেই। সে একবার রক্তিমদাকে এর কারণ জিগ্যেস করায় বলেছিল, সে কলকাতাতেই থাকে। কিন্তু এর বেশি বলা যাবে না নিরাপত্তার কারণে। অনেক সময় টেররিস্ট গ্রুপগুলো RAW-এর অফিসারদের প্রোফাইল হ্যাক করে। সেজন্যে চ্যাটবক্সে তার ঠিকানা বলা যাবে না।

তবে রক্তিমদার অবস্থান সম্বন্ধে একটা আবছা অনুমান অর্কর আছে। যদি রক্তিমদা সেটা জানার পর তার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে, সেজন্য অর্ক সেটা বলেনি তাকে। বার দুই রক্তিমদা মোবাইলে চ্যাট করেছিল তার সঙ্গে। টাওয়ার লোকেশনটা তখন অর্কর চ্যাটবক্সে ভেসে উঠেছিল —'সেন্ট ফ্রম ভবানীপুর'। ভবানীপুরে কি RAW-এর কোনও অফিস আছে?

অনেকক্ষণ ধরে অ্যাপার্টমেন্টে পুলিশ, সংবাদমাধ্যম, পাড়ার লোকজনে দাপাদাপি চলেছে। নীচের রাস্তায় গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে গেছিল। এখন অবশ্য সব শান্ত, নিঝুম। যারা সিতিদিকে পোড়াতে

গেছিল, তারাও ফিরে এসে একটু আগেই চলে গেল। শূন্য রাস্তা। কোথায় যেন একটা কুকুর কেঁদে উঠল।

রাত দুটো বাজে, নিশ্চয়ই মা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অর্ক পা-টিপেটিপে ঘরে ঢুকে অন্ধকার হাতড়ে মা-র মোবাইলটা নিয়ে আবার ব্যালকনিতে ফিরে এল। এতরাতে ডেস্কটপ খোলা যাবে না। মা-র ঘুম ভেঙে যাবে। মোবাইলেই কাজ সারতে হবে।

রক্তিমদার মেসেজবক্সে অর্ক টাইপ করল ৩৫২১। এবার রিপ্লাই এল ৫৭৪৩। আশ্বস্ত হল অর্ক। যাক পাওয়া গেল তাকে। অর্ক লিখল, 'মিশন সাকসেসফুল। বাট...

সে 'বাট' লিখে থেমে যাওয়ার পর রক্তিমদার জবাব এল, 'থ্যাঙ্কস। বাট? এনি প্রবলেম?'

অর্ক জবাব দিল, 'আমার খুব ভয় করছে? সিতিদি তো মরে গেল! আচ্ছা, সিতিদি যদি টেররিস্ট হয়, তবে টিভিতে CID তদন্ত হবে বলছে কেন? তোমরা কি ব্যাপারটা ওদের জানাওনি?

বেশ কিছু সময়ের নীরবতার পর জবাব এল, 'ডোন্ট ওরি। বি স্টেডি। RAW-এর কাজ এতটাই গোপনীয় যে, সব সময় তা রাজ্য সরকারকে জানানো যায় না। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা সরকারকে ব্যাপারটা জানাব।

অর্ক বলল, 'বুঝলাম, তবু আমার ভয় করছে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে ভালো হয়। তুমি কি ভবানীপুরে থাকো? চ্যাট বক্সে তোমার মোবাইল লোকেশনে দেখিয়েছিল ওটা।' কথাটা আজ বলেই ফেলল সে।

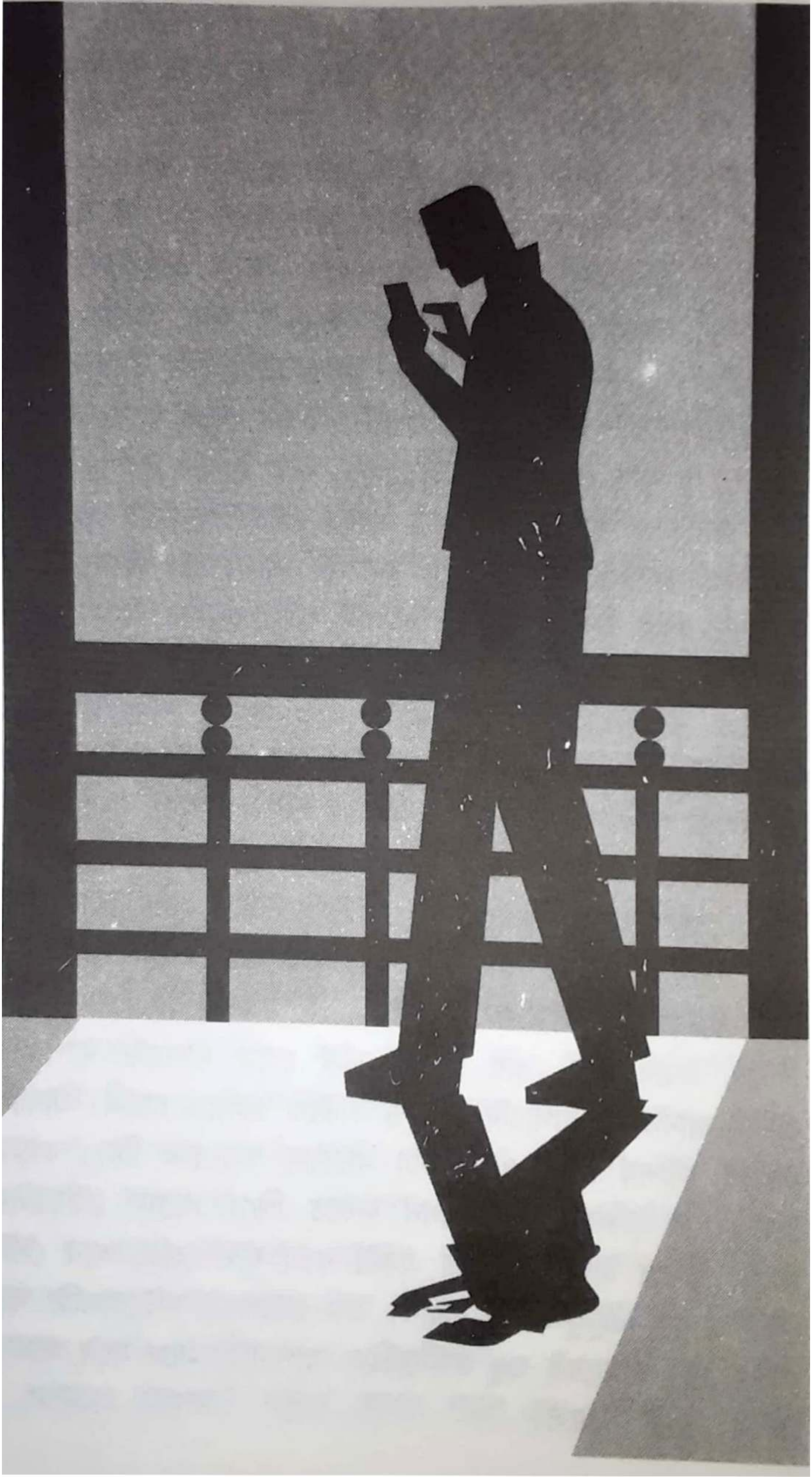
তারপর বলল, 'আমার স্কুল কাল ফার্স্ট পিরিওডে ছুটি হবে অ্যানুয়াল ফাংশনের রিহার্সাল চলবে বলে। আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে মেট্রো ধরে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব সেখানে। তুমি আসবে? আমার কেমন যেন ভয় করছে। তোমাকে একবার দেখলে সাহস পাব।'

বেশ খানিকক্ষণের নীরবতা। স্ক্রিনের দিকে চোখ রেখে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অর্ক। কুকুরটা কেঁদে চলেছে। তাতে চারপাশের

নিস্তব্ধতা যেন আরও বেশি লাগছে। এক সময় অর্কর মনে হতে লাগল রক্তিমদা হয়তো লাইনে নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা মেসেজ ভেসে উঠল, 'না, আমি ভবনীপুর থাকি না। তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি আমি। ভবানীপুর নয়, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের বাইরে ঠিক বেলা বারোটায় কালো রঙের একটা হোন্ডাই এসে তোমাকে তুলে নেবে। তারপর তুমি আমার কাছে আসবে। আমি আবার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। ভয় পেও না। তুমি দেশের জন্য বিরাট কাজ করেছ। তবে ওই কথাই রইল। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। চ্যাটটা ডিলিট করো। কাল দেখা হবে। বি স্টেডি এন্ড বাই।'

অর্ক চ্যাটটা ডিলিট করে ঘরের দিকে ফিরল। আর ওদিকে রাস্তার ওপর গাড়ির মধ্যে বসে অর্কর রক্তিমদাও চ্যাটটা ডিলিট করে ল্যাপটপের পাওয়ার অফ করে পাশে ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটাকে বলল, 'কিছু করার নেই। ছেলেটাকেও এবার পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আমার খেয়াল ছিল না মোবাইল থেকে চ্যাট করলে অনেক সময় টাওয়ার লোকেশন শো করে। আর অত দ্রুত যে CID এনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হবে, এটাও আনএক্সপেকটেড। বলা যায় না, সেসময় ফ্ল্যাটে যারা ছিল, তাদের আর সিতির বন্ধুদের জেরা করতে পারে CID। করাটাই স্বাভাবিক। জেরার মুখে ছেলেটা যদি সব বলে ফেলে আর 'ভবানীপুর' শব্দটা উচ্চারণ করে তবে সন্দেহের তিরটা আমার দিকে চলে আসবে। কারণ একমাত্র আমার বাড়িই ভবানীপুর।'

ড্রাইভারের সিটে বসা লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, রিস্ক নিয়ে দরকার নেই। ক্লোরোফর্ম করব ছেলেটাকে। তারপর হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে রাজারহাটের দিকে রাতে কোনও ভেরিতে চুবিয়ে দেব। খেল খতম। এবার শ্মশানে চলো। তাড়াতাড়ি কাজ সেড়ে বাড়ি ফিরতে হবে। আসা করছি, জিনিসটা পেয়ে যাব। চুনুয়া ডোম বলেছে ওই ট্রের মালগুলোকে আলাদা একটা বস্তায় রাখবে। শ্মশানযাত্রীরা যখন এদিক-ওদিক গেছিল, তখন আমি গিয়ে চুনুয়ার হাতে হাজার টাকার



একটা নোট দিয়ে এসেছি। পকেটে একটা বোতল ছিল, সেটাও দিয়েছি।' কথা শেষ করে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিল লোকটা।

ড্রাইভারের সঙ্গিনী, অর্কর ফেসবুকের রক্তিমদা জানতে চাইল, 'চুনুয়া, তোমার কাছে জানতে চায়নি, ওটা দিয়ে তুমি কী করবে?'

হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে সে জবাব দিল, 'করেছিল। আমি বললাম, 'আমার গুরুদেব তন্ত্রসাধক। সাধনার জন্য কুমারী মেয়ের চিতাভস্ম প্রয়োজন। এ ছাই গায়ে মেখে তিনি ধূমাবতীর সাধনায় বসবেন। লোকটা বিশ্বাস করল কথাটা। শ্মশান থেকে অনেক তান্ত্রিক তো ওদের কাছ থেকে খুলি, হাড়গোড়, ভস্ম ইত্যাদি গোপনে কিনে নিয়ে যায়। এ ব্যাপার নতুন নয় ওদের কাছে। সবচেয়ে বড় কথা, ও টাকা পেয়েছে। অত জেনে ওর কী লাভ! শুধু বলল, 'ওটা নেওয়ার সময় আরও পাঁচশো দেবেন।' আমি বললাম, 'দেব।' ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল।

ঠিক এই সময়টাতে, রাত দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত কলকাতা এক ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। তিনটের পর থেকেই আবার লোকজন পথে নামে। বিশেষত বিভিন্ন বাজারে মুটে, সবজি-মাছ ব্যবসায়ীদের আনাগোনা শুরু হয়। লোকজন পথে বেরোবার আগেই কাজ সেরে ডেরায় ফিরতে হবে। অ্যাক্সিলেটারে বেশ জোর চাপ দিয়ে লোকটা এরপর তার সঙ্গিনীকে প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা সিতি ঠিক কীভাবে জানল?'

সে জবাব দিল, 'ওর পায়ের হাড় বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমিই জানতাম। ব্যাপারটা ও অন্য কাউকে জানাতে চায়নি। আসলে নিজের সৌন্দর্য নিয়ে ওর একটা মারাত্মক অহংকার ছিল। কালো হলেও সে কৃষ্ণকলি। অপরেশন করতে গিয়ে পায়ের গোড়ালির কিছুটা ওপরে ইঞ্চি তিনেকের একটা কাটা দাগ হোক, আর সেটা কেউ জানুক, এটুকুও সে চায়নি। এক-একজনের সাইকোলজি বড় বিচিত্র হয়। আমাকেই শুধু জানিয়েছিল ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় বুদ্ধিটা খেলে।

ডক্টর মিশ্রর কাছে আমি নিয়ে যাই ওকে। মিশ্র ওকে বলে, প্রথম অপারেশনের তিনমাস পর আবার দ্বিতীয় অপারেশন করতে হবে একটা। কারণ তিনমাস অন্তত লাগবে আমাদের ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়তে। ততক্ষণ ওটা সিতির কাছে থাকাই নিরাপদ। প্রথম অপারেশন তো ঠিকমতোই হল। জাস্ট তিনদিন রেস্ট নেওয়ার পর সিতি নর্মালভাবে হাঁটতে শুরু করল। সব ঠিকই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই একদিন ওর পায়ে ব্যথা হবে, আর ঘটনাচক্রে আমাকে বা মিশ্রকে মোবাইলে ধরতে না পেরে সে সোজা এক্স-রে করাতে চলে যাবে, তা বুঝব কী করে? এখান থেকেই তো গণ্ডগোলের শুরু।'

গাড়ি চালাতে চালাতে লোকটা এরপর প্রশ্ন করল, 'কিন্তু শুধু এক্স-রে প্লেটটা দেখেই সে জিনিসটার ব্যাপারে কনফার্মড হয়ে গেলে কীভাবে? ওটা তো কোনও সার্জিকাল ফরেন বডিও হতে পারত? যেমন সার্জিকাল নাইফ-নিড্‌ল অনেক সময় ডাক্তারদের গাফিলতিতে থেকে যায়।'

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে সিতির অজানা বান্ধবী জবাব দিল, 'আমি প্রথমে ওকে তা-ই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে কনফার্মডভাবে বলল জিনিসটা কী। আসলে সরকারি তরফে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হলেও, অসমর্থিত খবরের সূত্র ধরে একটা ইংরাজি দৈনিকে খুব ছোট করে খবরটা ছাপা হয়েছিল। সেটায় জিনিসটার বিবরণও দেওয়া হয়েছিল। সিতি খবরটা পড়েছিল। শুধু মেধাবী নয়, প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তিরও অধিকারী ছিল ও। জিনিসটার আকৃতি দেখে ব্যাপারটা ধরে ফেলে। তবে ও আমাকে সন্দেহ করেনি, করেছিল মিশ্রকে। সেই আসল ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত এবং আমাদের অজান্তে এই কৌশল নিয়েছিল বলে ও ধারণা করেছিল। আমাকে বলছিল, কীভাবে এটা নিয়ে পুলিশের ওপরতলার কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, সে-বন্দোবস্ত করতে। আমি তিনদিন সময় চেয়েছিলাম...

শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছে রাস্তার পাশে এক জায়গাতে গাড়িটা

দাঁড়িয়ে পড়ল। চালকের আসন থেকে নামল লোকটা। টিপটিপ করে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শুনশান রাস্তা। এদিকে-ওদিকে দু-তিনটে ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। শ্মশানে লাশ নিয়ে এসেছে ওই গাড়িগুলো। বৃষ্টির মধ্যে কিছুটা তফাতে শ্মশানের ভেপার ল্যাম্পের আলোগুলো কেমন যেন ম্যাটম্যাট করছে। গাড়ি থেকে কিছুটা তফাতে শ্মশানে গিয়ে ঢুকল লোকটা।

সামনের চত্বরটা ফাঁকা। বৃষ্টির জন্য শবযাত্রীরা সব ওয়েটিং রুমের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। টুকরো টুকরো কথাবার্তার শব্দ আসছে। চত্বরে জীবন্ত প্রাণী বলতে শুধু একটা ষাঁড়। ওয়েটিং রুমের বাইরে দেওয়ালে গা ঘেঁষে আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে মোড়া একটা মড়া খাটে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। সেই খাটের চারকোণে বাঁধা রজনীগন্ধার ডাঁটগুলোকে খাচ্ছে ষাঁড়টা। লোকটা দ্রুত পেরিয়ে গেল সে-জায়গাটা। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে একটা গলি ধরে এগিয়ে সে চুনুয়াকে বসে থাকতে দেখল। অন্য কেউ আশেপাশে নেই। শুধু নাভি নিতে আসার সময় শবযাত্রীদের এক-দুজন এদিকে আসে। লোকটা সটান গিয়ে তার সামনে হাজির হয়ে বলল, 'আমি এসেছি। ভস্মটা দাও।'

চুনুয়া তার নেশাগ্রস্ত লাল চোখে লোকটার দিকে তাকাল। আবছা একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। হ্যাঁ, সে চিনতে পেরেছে তাকে। চুনুয়া উঠে দাঁড়াল। তারপর উঠে গিয়ে চুল্লিঘরের ভিতরে ঢুকে বাজারের ব্যাগের মতো একটা পেটমোটা চটের ব্যাগ নিয়ে এল। লোকটা পাঁচশো টাকার একটা নোট বার করে চুনুয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পুরোটা আছে তো?

চুনুয়া নোটটা নিয়ে ব্যাগটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ট্রে থেকে পুরো বডিটাই ঢেলে দিয়েছি এর মধ্যে আগুন নিভে যাওয়ার পর। এক ব পড়েনি। এর আগেও দু-তিন জন সাধুবাবাকে এ জিনিস দিয়েছি। আমি জানি, পুরো বডিটাই লাগে।

লোকটা ব্যাগটা হাতে নিয়ে একবার আলতো করে ঝাঁকাল। খুব বেশি হলে কেজি পাঁচেক ওজন হবে ব্যাগটার। একটা পঞ্চাশ-ষাট

কেজি ওজনের যুবতী মেয়ে মরার পর পাঁচ কেজি হয়ে গেল! মনে মনে হাসল লোকটা। তারপর যে-পথে সে এসেছিল, সে-পথে আবার এগোল গাড়িতে ফেরার জন্য। সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা অনুভব করল, এখনও একটা হালকা গরম ভাপ ছড়াচ্ছে ব্যাগটার থেকে। যেন মৃত্যুর পরও তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে মেয়েটা।

গাড়ির কাছে এসে পিছনের সিটে উঠে বসল লোকটা। তার সঙ্গিনী এবার চালকের সামনে। সে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পরমুহূর্তে শুধু একবার বলল, 'কী বিশ্রী গন্ধ!'

লোকটাও এবার গন্ধটা পেল। সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ছাইয়ের সঙ্গে পোড়া মাংসের গন্ধটা এখনও লেগে আছে। তাড়াতাড়ি ড্রাইভ করো। তোমার বাড়ি হয়ে আবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আলো ফুটবে।'

গন্তব্যে পৌঁছোতে তাদের মিনিট কুড়ি সময় লাগল। বড় রাস্তা থেকে একটা গলির মধ্যে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে নিঃশব্দে দাঁড়াল গাড়িটা। ব্যাগটা সমেত দুজন গাড়ি থেকে নেমে তালা খুলে একটা ঘরে ঢুকল। ভিতরে ঢোকার আগে অবশ্য একবার তাকিয়ে নিল মেয়েটা। না, আশেপাশের বাড়িগুলো সব দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। বৃষ্টিটা যেন আরও বাড়ছে। তাতে ভালোই হয়েছে। কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে কোথাও নিশ্চয়ই শুয়ে আছে। নইলে অন্যদিন হলে এত রাতে পাড়ায় লোক দেখে চিৎকার করত তারা।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালানো হল। মেয়েটা একটা প্লাস্টিক শিট এনে সেটা বিছিয়ে দিল টেবিলের ওপর। লোকটা এরপর ব্যাগটা খুলে অতি সাবধানে ভিতরের জিনিসগুলো ঢালতে লাগল টেবিলের ওপর। এ কাজটা করতে একটু সময় লাগল। ঘর ভরে গেল মাংস-পোড়া গন্ধে। মেয়েটা বলল, 'এ গন্ধটা আবার কেউ টের পাবে কি না কে জানে? তুমি চলে যাওয়ার পর জানলা-দরজা সব খুলে দেব। যাতে বাইরের ভেজা বাতাস

এসে গন্ধটা মুছে দেয়।'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, গাড়ির ভিতরটাও গন্ধ হয়ে গেল।'

উজ্জ্বল আলোর নীচে টেবিলটার ওপর ছড়িয়ে আছে সিতির ছাই। সিতি ছাই হয়ে গেছে। সেই ছাইয়ের মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা ফ্যাটফ্যাটে হাড়ের কিছু কুচিও। সঙ্গীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সেই ছাই আর হাড়ের কুচির মধ্যে আঙুল ডোবাল মেয়েটা। এখনও তার মধ্যে উষ্ণতা জেগে আছে।

মেয়েটার মনে পড়ল, নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে থাকা সিতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল সে। এখনও কি সে সিতির গায়ে হাত বোলাচ্ছে? মনে মনে হাসল সে। তার আঙুলগুলো সেই ছাইয়ের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল নির্দিষ্ট একটা জিনিস। কোনও শক্ত জিনিসে হাত লাগলেই সে সেটা টিপছে। অধিকাংশই হাড়ের টুকরো। চাপ দিলেই মট করে ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু সে জিনিস তো ভাঙার নয়।

অবশেষে এক সময় আঙুলে সত্যিই শক্ত মতো কী একটা ঠেকল। ছাইয়ের ভিতর থেকে সে বার করে আনল জিনিসটা। ছোট্ট একটা জিনিস। খুব বেশি হলে একটা আধুলির মতো হবে। তার গায়ে অবশ্য খাঁজ কাটা আছে। লোকটা একটা রুমাল এগিয়ে দিল তার দিকে। মেয়েটা জিনিসটার গায়ের ছাইগুলো রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই সেই জিনিস!'

রোজ সাতটায় ঘুম ভাঙে অর্কর। আজ আটটা হল। মা তৈরি হচ্ছেন অফিসে বেরোবার জন্য। ঠিক সাড়ে আটটায় অফিসের পুলকার আসবে রাস্তার মোড়ে। জানলার বাইরে তাকালেন। শেষ রাত থেকে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তিনি অর্ককে বললেন, 'তোমাদের স্কুলে তো অ্যানুয়াল প্রোগ্রামের জন্য ভালো করে ক্লাস হচ্ছে না। থাক, এই বৃষ্টির মধ্যে আজ আর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। আমিই মনে হয় রাস্তার মোড়

পর্যন্ত পৌঁছোতেই ভিজে যাব।'

খাটে সদ্য ঘুম থেকে উঠে বসা অর্ক প্রথমে বলল, 'হ্যাঁ, যাব না।' কিন্তু তার পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল রক্তিমদা আজ দেখা করবে তার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে অর্ক বলে উঠল, 'না, না আজ যেতেই হবে। আমাদের ক্লাসের ছেলেরা যে নাটক করছে, আজ তার ফাইনাল রিহার্সাল। সেটা দেখব।'

মা আর কিছু বললেন না। শুধু বললেন, 'বৃষ্টিতে ভিজে আবার জ্বর বাধিও না কিন্তু...'

মা অফিস চলে যাওয়ার পর বিছানা থেকে উঠে পড়ল অর্ক। স্পষ্ট একটা উত্তেজনা অনুভব করছে সে। আজ তার প্রথম দেখা হবে রক্তিমদার সঙ্গে। স্নান খাওয়া ইত্যাদি সেড়ে ঠিক দশটার সময় দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরোল সে। সিড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে মুহূর্তের জন্য একবার সে থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল 3F-এর দিকে। বুকটা কেমন ছ্যাৎ করে উঠল। আর সে সেখানে দাঁড়াল না। দ্রুত নীচে নামতে শুরু করল।

রেনকোট পরে সে হাঁটা লাগল স্কুলের দিকে। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে স্কুলে পৌঁছে গেল সে। তাকে দেখে বন্ধুরা ঘিরে ধরল। টিভি-খবরের কাগজের মাধ্যমে সবাই জেনে গেছে যে অর্কদের অ্যাপার্টমেন্টে একটা খুন হয়েছে। সবাই জানতে চায় ব্যাপারটা কী? অর্ক একটু দায়সারাভাবে ঘটনাটা বলল তাদের।

সাড়ে দশটায় প্রেয়ারের ঘণ্টা পড়ল। তারপর ক্লাস শুরু হল, কাজেই বন্ধুদের খুন সংক্রান্ত সেই আলোচনা আর বেশি দূর এগোল না। একটা জানা অঙ্ক এদিন ক্লাসে ভুল করল অর্ক। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে।

ক্লাস শেষ, আর ছুটির ঘণ্টা বাজল একই সঙ্গে। যারা রিহার্সাল দেবে, তারা শুধু স্কুলে থাকবে, অন্যদের ছুটি। ঘণ্টা বাজার পর কাউকে আর তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ক্লাসরুম ছেড়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্কুল থেকে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন দশ মিনিটের হাঁটা পথ। অর্ক সেখানে পৌঁছে গেল।

পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন তার ঘড়িতে বারোটা বাজাতে দশ। মেট্রো স্টেশনের বাইরে রেলিং-এর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল সে। হঠাৎ তার কানে এল তার উদ্দেশে কে যেন বলল, 'অর্ক, তুই এখানে?'

অর্ক তাকিয়ে দেখতে পেল স্নিগ্ধাকে। স্নিগ্ধা সেন। অর্কদের এক ক্লাসেই পড়ে সে। পার্ক স্ট্রিটেই থাকে। সে-ও স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ তাকে দেখে আর তার প্রশ্ন শুনে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে অর্ক বলে ফেলল, 'এখানে, একজন দেখা করতে আসবে তাই এসেছি।'

'গার্লফ্রেন্ড নাকি?' স্নিগ্ধা হেসে প্রশ্ন করল।

অর্ক জবাব দিল, 'না, না, তেমন কিছু না।'

'বাই' বলে স্নিগ্ধা এরপর পা বাড়াল অন্য দিকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অর্ক।

ঠিক বারোটা বাজে। এস্প্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের দিক থেকে একটা হুন্ডাই এসে থেমে গেল অর্কর সামনে। সামনের জানলার কাচটা একটু ফাঁক হল। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে খুব সুন্দর দেখতে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা মেয়ে। মিষ্টি হেসে সে বলল, 'তুমি অর্ক তো?'

অর্ক জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

সেই মেয়েটি এরপর বলল, 'আমাদের স্যার, মানে রক্তিমদা তোমাকে নিতে পাঠিয়েছেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। এখানে গাড়ি দাঁড়াতে দেয় না। এখনই ট্রাফিক সার্জেন্ট ছুটে আসবে।'

পিছনের দরজা খুলে গাড়িতে ওঠার সময় অর্কর হঠাৎই চোখ গেল উল্টোদিকের ফুটপাতে। স্নিগ্ধা সেখানে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অর্ক একটু ইতস্তত করে গাড়িতে উঠে পড়ল।

স্নিগ্ধা উলটোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। ২৩২৩ নম্বরের কালো হুন্ডাইটাতো তার চেনা গাড়ি। তাদের বাড়ির সামনে মাঝে মাঝে পার্ক করা থাকে...

৬

'একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। উত্তরটা মিলছে না।' প্রায় অন্ধকার ঘর, শুধু বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পের একটা আলো জ্বলছে—পেপারওয়েট আঙুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতেই কথাটা বললেন সি.আই.ডি অফিসার অনঙ্গ দেব।

লক্ষ্য উলটোদিকে বসে থাকা জুনিয়র অফিসার বিকাশ দত্ত, প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে ঘণ্টাখানেক আগে যে এসেছে আলোচনা করতে।

'ঠিকই বলেছেন স্যর। আমারও যে মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু ভেবেছি যে, বহু ক্রাইমের ক্ষেত্রেই এই ধরনের বেসিক মিসটেক হয়, আর তার জন্যই খুনিরা ধরা পড়ে শেষপর্যন্ত...তাই এক্ষেত্রেও সেটা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।'

'ঠিক। একেবারে ঠিক কথা। কিন্তু গোটা ঘটনার বিচার করো। কানেকশনগুলো দেখো, মোটিভ অফ ক্রাইম অ্যানালাইজ করো। তারপর ভাবো যে সেখানে এইসব কাঁচা ভুলগুলো হয়ে গেল? এটা সম্ভব? আর এক-আধটা ভুল নয়, পরপর এতগুলো? উহুঁ বিকাশ, কোথায় একটা তার কেটে যাচ্ছে হে...আচ্ছা, তুমি তো পুরো কেস তদন্ত করেছ, পুরো স্টোরি তোমার মাথায় আছে এই মুহূর্তে...খুনের কারণ ছাড়ো, সিম্পল ভুলগুলো একটু বলে যাও তো শুনি। অনঙ্গ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

'চেষ্টা করছি স্যর,' বিকাশ দত্ত মনসংযোগ করার জন্য একটু সময় চুপ করে ভেবে নেয়, তারপর আস্তে আস্তে শুরু করে— 'প্রথমেই আসবে সিতির ডেথ সার্টিফিকেট; ওটা জাল সার্টিফিকেট। তারপর ওই বাচ্চাটাকে দিয়ে ওষুধের শিশি পালটে দেওয়া, তাও ফেসবুকে ইনস্ট্রাকশন পাঠিয়ে, ছেলেমানুষি। প্ল্যানচেটের গল্প, নর্টন অ্যান্টিভাইরাসের ক্যাশমেমো সিতির বাড়িতে ফেলে যাওয়া, পায়ের

গোড়ালি অপারেশন করে মেটাল ক্যাপসুল ঢোকানো আর সেটা উদ্ধার করতে ওইরকমভাবে ডোমের সঙ্গে অ্যারেঞ্জ করা, যে খবর দু-মিনিটে রাষ্ট্র হবেই...ঠিকই বলেছেন স্যর, চূড়ান্ত অ্যামেচার খুনির দল।

—আর পোস্টমর্টেম এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা, সোর্স এপ্লাই করে? অথবা পুতুল পুড়িয়ে আত্মাকে ডেকে আনা! শেষে দিনমানে একটা বাচ্চাকে তার বন্ধুর চোখের সামনে 'ইলোপ' করার বুদ্ধি; কী করত নিয়ে গিয়ে সেকথা ছেড়ে দিয়েই ধরো বলছি—এ কাজ কোনও পাকা মাথার ক্রিমিনাল করবে, সি.আই.ডি. পেছনে লেগে আছে জেনেও? একটাই উত্তর—করবে না।

তাহলে দুটো যুক্তি দাঁড়ায়। প্রথম যুক্তি হল, এই মেয়েটার খুনের পিছনে দুটো আলাদা গ্রুপ কাজ করছে—কিন্তু ঘটনার মধ্যে দু-দলই জড়িয়ে পড়েছে একসঙ্গে। সেক্ষেত্রে একটা গ্রুপ মৃত মেয়েটার বন্ধুবান্ধব, যারা কেউ হারডেন্‌ড্ ক্রিমিনাল নয়। তাদের ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ছে অনায়াসে। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রুপ যারা একটা ডেফিনিট পারপাস নিয়ে মেয়েটিকে খুন করতেই চাইছিল, যাদের গোটা অ্যাপ্রোচ থ্রু-আউট সেই প্রমাণ দিচ্ছে—তারাও এত কাঁচা ভুলগুলো করল কেন?'

'সত্যি, এটা বেশ অ্যাবনরমাল মনে হচ্ছে। তাহলে স্যর, দ্বিতীয় যুক্তিটা কী হতে পারে?'

'তার আগে বলো, চার্জগুলো কীভাবে সাজিয়েছ?'

'চার্জ এখনও লোক ধরে ধরে সাজাইনি। প্রথমে ইনসিডেন্টগুলো পরপর লিস্ট করেছি...মোটামুটি একটা ক্রোনোলজি মেইনটেন করে—পাশে লিখেছি প্রোবেবল সাসপেক্ট বা সাসপেক্টদের নাম, যারা ওই ঘটনার জন্য দায়ী হতে পারে। থার্ড রো-তে ঘটনার ছোট বাট ডিটেইল্‌ড সামারি আর কারা সেখানে হাজির ছিল তাদের নাম-ঠিকানা বিবরণ...এই আর কী!'

'গুড, ঠিকই আছে। ক'টা অ্যারেস্ট হল?'

'যে মেয়েটা খুন হয়েছে তার ফ্ল্যাটের উপরের বাচ্চাটা ছাড়া

সবাই...ওকে ইনটারোগেট করা হয়েছে আর ওর বাবা-মাকে বেশ একটু কড়াভাবেই বলে আসা হয়েছে যে ছেলেকে কোথাও না পাঠাতে, কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না যায়, আর একেবারেই চোখে-চোখে রাখতে। বাড়ির সামনে সাদা পোশাকের লোকও রেখে দেওয়া হয়েছে।'

'বেশ, এবার তাদের পরিচয় আর কেস কানেকশন, মানে তুমি যেভাবে সাসপেক্ট করছ ওদের, একটু ছোট করে বলো।'

'ঘটনার অর্ডারটা মেনে বলি। প্রথমে প্রলয়েশ, প্রফেশন বলতে যা বোঝায় তার কোনওকিছুর বালাই নেই—জ্যোতিষ, তন্ত্র, প্ল্যানচেট এইসব করে দিন চলে, এর কোনওটাই সিরিয়াসলি করে না, প্লেন বুজরুকি। আর এগুলো সবই ওর 'কভার'। মদ্যপ, অন্য নেশাও আছে। এইসব বুজরুকদের কিছু কনট্যাক্ট ডেভেলপ করে সমাজের ছোট-বড় সবরকম জায়গায়, এমনকী পুলিশমহলে, এরও সেরকম কিছু কনট্যাক্ট আছে। কথাবার্তায় মোটামুটি চৌকশ। খুব সম্ভব, ড্রাগের আউটলেট হিসাবে কাজ করে। কারণ...'

'কারণ, পুতুলগুলো পুড়লে যে ধোঁয়া বেরোয় সেটা লো-ইনটেনসিটি ব্রাউন সুগারের ধোঁয়া, লোক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সঙ্গে হ্যালুসিনোমেনিক ড্রাগ থাকে। ঠিক আছে, নেক্সট।'

'এর পর মেঘনা।'

'না, তার আগে ওই ছেলেটা যার সঙ্গে মৃত মেয়েটার কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল—তার ব্যাপারটা শুনব।'

'ও আচ্ছা, তাহলে মেরুন। বেশ—মেরুন শক্তসমর্থ ছেলে, যদিও মানসিকভাবে নয়, ফিজিকাল অ্যাপিয়ারেন্সের দিক দিয়ে বললাম। সম্পন্ন বাড়ির ছেলে, টাকাপয়সা আছে, ভালো হাতখরচ পায়—প্রয়োজনে সিতিকে মাঝেমধ্যে টাকা দিয়েছে, আবার সেটা বলেও বেড়ায়।

প্ল্যানচেটের দ্বিতীয় মিডিয়াম ছিল। কিন্তু কিছু কথা বলতে গিয়ে অজ্ঞান মতো হয়ে পড়ে। সম্ভবত পুতুলে ভারী ডোজ দেওয়া হয়ে থাকবে। স্ট্রাইকিং হল, ও প্রলয়েশকে বিশ্বাস করে না, অনেক কিছুতে

প্রলয়েশ জড়িত বলে ওর দৃঢ় বিশ্বাস। সিদ্ধেশকে সেকথা বলেছে।

'নেক্সট। বাকি কিছু ইম্পর্টেন্ট থাকলে পরে শুনব।' অনঙ্গ বললেন।

'তাহলে এবার চিন্নি; চিন্ময়ী সরকার। সহজ, সরল মেয়ে, সাতে-পাঁচে থাকে না। সিদ্ধেশকে বিশ্বাস করে না। কারণ, ওর ধারণা সিদ্ধেশ মেঘনার প্রতি দুর্বল। কিন্তু একটা জরুরি তথ্য দিয়েছে—ঘটনার দিন মেঘনা একটা নর্টন অ্যান্টিভাইরাস কিনেছিল, সেই বিলটা সিতির বাড়ির সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে ও পেয়েছিল।'

'ঠিক আছে, তাহলে সিদ্ধেশ?'

'সিদ্ধেশ ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্, সেজন্য কমপ্লেক্সে ভোগে। মেঘনার উপর দুর্বল, কিন্তু মেঘনা নয়।

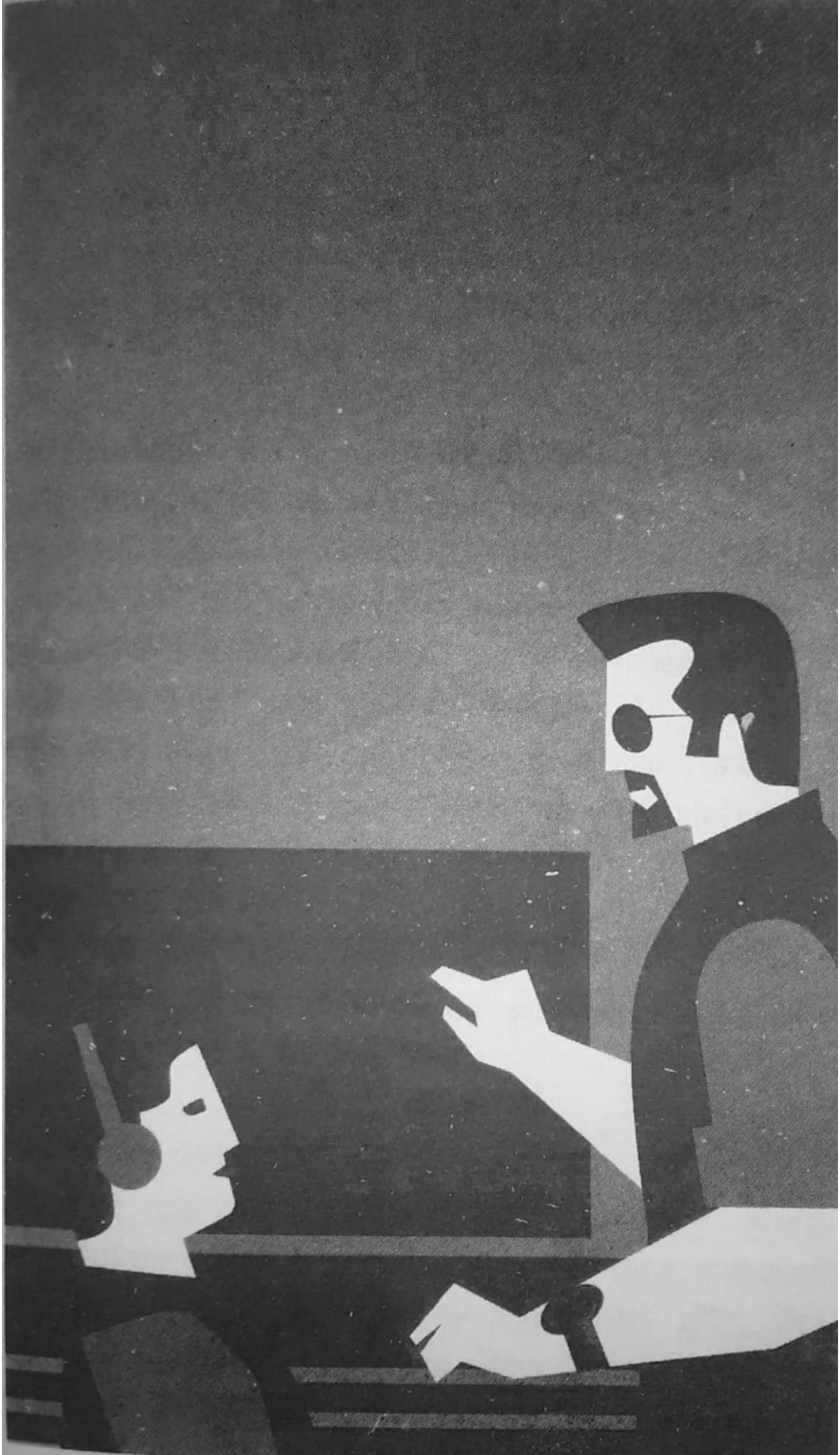
'একটা কথা বলা হয়নি যে, মাস ছয়-সাত হল সিতি প্রলয়েশের সঙ্গে দেখা করে ওর কোনও সমস্যা নিয়ে। তারপর আরও বারকয়েক যায়। প্রলয়েশ তারপর সিতিকে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করে, যার জন্য বই লিখে বেশ ভালো টাকা রয়্যালটি পেলেও সিতির হাতে টাকা থাকত না। মেরুনের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হল। এখানে দুটো ব্যাপার আছে—সিতির কোনও সিক্রেট জেনে নিয়ে প্রলয়েশ ওকে ব্ল্যাকমেল করছে, আবার এই টাকা দেওয়া-নেওয়া করতে গিয়ে বা অন্য কোনওভাবে ইন দ্য প্রসেস সিতি এমন কিছু জেনে ফেলেছে যার জন্য ওকে সরিয়ে ফেলা দরকার হয়ে পড়ল।

'এগিয়ে যাও, গো-অন।'

'দুটো ব্যাপার ট্র্যাক করছি, আশাকরি কাল কি বড়জোর পরশুর মধ্যে পেয়ে যাব। একটা হল, ওই অর্ক বলে ছেলেটাকে যারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল; আমরা সেই গাড়ি ফলো করে ছেলেটাকে বের করে নিয়ে এসেছি, কিন্তু যে গ্রুপটা ওকে নিয়ে গেছিল, তারা পালিয়ে যায়। অসুবিধা হবে না, ধরে নেব।

'আর দ্বিতীয়টা হল, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট—সিতির। মৃত্যুর কারণ, হেভি মেটাল পয়জনিং, এটা একটু সমস্যার ব্যাপার হল স্যর।'

চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে উঠলেন অনঙ্গ দত্ত।



'বেরিয়ে পড়ো বিকাশ। তোমার টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, এক্ষুনি। দেরি কোরো না। অর্ক বলে ছেলেটার ওই ক্লাসমেট, কী যেন নাম?

—কে? স্নিগ্ধা?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই স্নিগ্ধাকে যোগাযোগ করে পার্ক স্ট্রিটের বাড়িটা খুঁজে বের করো, যেখানে ওই হুন্ডাই গাড়ি ও দেখেছে। বাড়ি সার্চ করো ইমিডিয়েটলি। তোমরা তো অর্ককে উদ্ধার করেছ ভবানীপুরের ইন্দ্র রায় রোডের পাশে সরু গলি থেকে, তাই তো?'

'হ্যাঁ স্যর।'

'তাহলে এখন পার্ক স্ট্রিটে যাও প্রথমে...তার আগে সবক'টাকে ছেড়ে দাও। শুধু প্রলয়েশ বাদে। ওটা স্কাউন্ড্রেল। ছেড়েও কোনও লাভ হবে না।'

'বাকিগুলোকে ছেড়ে দেব বলছেন?'

'হ্যাঁ, আসল লোক এখনও বাইরে, তাকে ধরতে হলে ট্র্যাপ সেট করতে হবে, না হলে ধরা মুশকিল। ওদের ছেড়ে দিয়ে ওদের ল্যান্ডফোন, মোবাইল আর ইন্টারনেট ফলো করো। ছাড়ার মুহূর্ত থেকে। আর ফিজিকাল মুভমেন্ট ফলো করতে লোক লাগাও। এস.টি.ডি. বুথ থেকেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে পারে, দেখো।

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রথম দু-ঘণ্টার মধ্যে খবর পেয়ে যাবে। চলো, বিকাশ। শুরু করে দাও।'

থানা থেকে বেরিয়ে কোনও কথা হয়নি। সিতির মৃত্যু আর তারপর পুলিশের টানাটানি, এক-একজনকে দু-তিন ঘণ্টা ঘরে জিজ্ঞাসাবাদ ওদের সবার নার্ভ শিথিল করে দিয়েছে। তুলনায় মেঘনা একটু স্টেডি ছিল, সম্ভবত শ্মশানঘাটে যায়নি বলে স্ট্রেইন অতটা পড়েনি। বাকি সবাই ভেঙে পড়েছিল। সিদ্ধেশ কি একটু বেশিই ধাক্কা খেয়েছে ওদের মধ্যে, কারণ প্রলয়েশের উপর ওর অনেক

আস্থা, সেই প্রলয়েশকে পুলিশ আটকে রেখে দিল, এত সোর্স প্রলয়েশদার, তবু ওকে পুলিশ ছাড়ল না। তাহলে কি মেরুন যা বলছে তা-ই?' সিদ্ধেশের মনের ভেতর তোলপাড় হয়ে চলে। মেরুন বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছে। একটাও কথা বলছে না; আসলে সবাই গোটা ঘটনার আকস্মিকতায় থম মেরে গেছে।

'বস্, সব ঠিক আছে এখন!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আজ একটু ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেছে। ঝুঁকি বলব না, বরং বোকামিই বলব।'

'ছাড়ো। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।'

'তুমি কোথায়?'

'বাড়িতে, কেন?'

'মানে?'

'মানে এক বন্ধুর বাড়িতে, লাউডন স্ট্রিটে। তুমি?'

'অন দ্য ওয়ে। থ্রি নট ওয়ান সিক্স ছেড়ে দিয়ে ফাইভ-সিক্স-জিরো-টু-ফাইভের পথে। একবার টাচ করেই বেরিয়ে যাব। ওভার।'

'উইশ ইউ সাকসেস। ওভার। রক্তিম ফোন বন্ধ করে দিল।'

'তাহলে চাঁদিপুর। পার্ক স্ট্রিট থেকে এখন চাঁদিপুরের পথে; ভালো। হেভিমেটালের ক্লু এবার পাওয়া গেল মনে হচ্ছে।' কম্পিউটার থেকে চোখ সরিয়ে এনে নিজের মনেই কথা বলতে থাকেন অনঙ্গ দেব। তার মধ্যেই মোবাইলে কানেক্ট করে নেন বিকাশ দত্তকে—'বিকাশ, থ্রি নট ওয়ান সিক্স মানে পার্ক স্ট্রিট, এটা বুঝেছ তো। ওইভাবে সামনে সাত বসিয়ে নিলে পরেরটা চাঁদিপুরের পোস্টাল কোড। ভেরি সিম্পল। স্টেটের বর্ডারে খবর দিয়ে দাও,

এখনও বোধহয় খড়্গাপুর পৌঁছোয়নি। পুলিশ ধরে নেবে। গাড়ির ডেসক্রিপশন দিয়ে দাও, নাম্বার প্লেট পালটাতে পারে।

'বিকাশ, খেয়াল কোরো—চাঁদিপুর মানে আই.টি.আর, ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ। দেশের সেরা মিসাইল সব ওখানে টেস্ট করা হয়।

'গত বছর এপ্রিল মাস নাগাদ ওদের একটা রিসার্চ ডিভিশনে ভোর চারটের সময় আগুন লাগে। ডি.আর.ডি.-ও জানিয়েছিল যে আগুনে কেউ আহত হয়নি; কিন্তু গভীর কোনও কারণ আগুন লাগবার পিছনে ছিল কি? কোনও কোড চুরি হওয়ার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ওই পিনিয়ানের মতো খাঁজকাটা মেটাল ক্যাপসুলটার মধ্যে কোনও কোড বা ডকুমেন্ট এমবেডেড্ থাকা খুবই সম্ভব। যাক, তুমি যা করছ করো, আমি ডাঃ মিশ্রকে খোঁজার চেষ্টা করি বরং। কেন ওই ক্যাপসুল সিতির গোড়ালিতে ঢোকানো হয়েছিল? কোন কোন হেভিমেটালে তৈরি ছিল ক্যাপসুলটা, দেখতে হবে। আপাতত আমি রাখছি বিকাশ।' অনঙ্গ ফোন কাটলেন।

আর ঠিক তখনই কলকাতা থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে একটা ল্যাবরেটরিতে যে দুটো লোক এতক্ষণ একমনে কানে হেডফোন লাগিয়ে একদৃষ্টে কম্পিউটারে চোখ দিয়ে বসে ছিল, তাদের মধ্যে বয়স্ক লোকটা কানের থেকে হেডফোন সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল—'এখন পর্যন্ত ঠিকই চলছে। ওই ছেলেছোকরাদের দিকেই পুলিশ ডাইভার্টেড হয়ে গেছে। আর একটা দিন এভাবে কেটে গেলে আমরা কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে পারব। অসুবিধা হবে না।'

অন্য লোকটা কোনও উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে প্রথম লোকটা একটু বিড়বিড় করে বলল, 'শুধু দুটো ঝামেলা হয়ে রইল...'

'কোন দুটো ঝামেলা?' একটু অন্যমনস্কভাবেই বলে দ্বিতীয় লোকটা।

'বুঝছ না? ডাঃ মিশ্র আর হেভি মেটাল...এইদিকে পুলিশের মনটা না গেলেই একেবারে সোনায় সোহাগা হয়ে যেত।

'তা কী করে হবে? পোস্টমর্টেম রিপোর্টেই তো পয়জনিং পাওয়া গেছে। আর তাকে ট্রেস করতে গেলে ডাক্তার মিশ্র এসে পড়বেই। আপনার প্রিকশান নেওয়া উচিত ছিল। এখন হা-হুতাশ করে লাভ কী?'

'তোমার মুশকিল হল, বড্ড বেশি বাজে কথা বলো। কী করতে হবে আর না-হবে সেটা আমি বোধহয় তোমার চেয়ে ভালোই বুঝি। আর কোথায় কি প্রিকশান নিতে হবে সেটাও জানি। তুমি যেটা জানো না বা বোঝো না—সেটা হল একটা অপারেশনে কতটা সতর্কতা নেওয়া বাস্তবে সম্ভব—বিশেষ করে আড়াল থেকে গোটা ব্যাপারটা যখন অপারেট করতে হয়। তাই বলছি, বাজে না বকে তোমার কাজটা করে যাও। এ ব্যাপারটা আমাকেই বরং ভাবতে দাও।' প্রথম লোকটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

অপেক্ষাকৃত কমবয়সি দ্বিতীয় লোকটা চুপ করে যায়। প্রথম লোকটা ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে বারবার নিজের মাথার চুল ঘষতে ঘষতে অস্থির হয়ে ওঠে—'ওই জ্যোতিষীটা...ওটা একটা হামবাগ...রাস্কেল...বড় বড় কথা খালি, আর পয়সা...কোনও কাজের না...ওটাকে জড়ানোই ভুল হল। এখন সামলাতে হচ্ছে সব কিছু। দেখি আমার ফোনটা দাও...'

টেবিলের উপর রাখা মোবাইল ফোনটা এগিয়ে দেয় দ্বিতীয় লোকটা। প্রথম লোকটা ফোনের অ্যাড্রেস বুক খোলে।

ওরা দুজনে কেউই জানতে পারে না যে, একটা প্রকাণ্ড কালো মোষের মতো গাড়ি আলো নিভিয়ে বাইরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে ল্যাবরেটরির দরজার কাছে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির ভেতরের লোকগুলোর সবার হাতেই নাইন এম-এম পিস্তল।

৭

বন্ধুদের হাত নেড়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোল সিদ্ধেশ। সবে সন্ধে হয়েছে। ঘড়িতে ছ'টা দশ। কিন্তু দুপুর থেকেই বৃষ্টি পড়ছে ঝিপঝিপ করে। বাসস্ট্যান্ডটা তাই বেশ ফাঁকা। সঙ্গে ছাতা নেই। মাথা-মুখ ভিজে যাচ্ছে। তবু আরাম লাগছিল সিদ্ধেশের।

থানার ভিতরটায় বিশ্রী দমবন্ধ করা গরম। সারা গা যেন চিটচিট করছে। মুখের ভিতরে একটা তিতকুটে ভাব। চোখের ওপর সারাক্ষণ ভাসছে সিআইডি অফিসারের মুখটা। কীরকম একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ভদ্রলোকের। পেটের ভিতরের কথা যেন টেনে বের করে আনবে। সামনে বসে যখন স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিলেন, তখন শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করছিল সিদ্ধেশের। চিন্নি, মেরুন, ওদের কী হচ্ছিল কে জানে? সবাইকে তো আলাদা আলাদা করে ডাকছিল।

একটা মিনিবাস এসে দাঁড়াল। এটাতে গেলে মাঝখানে নেমে আবার বাস বদলাতে হবে। নাহলে অটো।

এক সেকেন্ড ভাবল সিদ্ধেশ। দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না। বৃষ্টিটাও পড়ছে সমানে। উঠে পড়ল বাসটায়। আর একটা লোকও উঠল।

ফাঁকা নয় বাসটা। আবার চাপাচাপিও নেই। ড্রাইভারের পিছন দিকটায় দাঁড়াল। জানলা দিয়ে ভিজে হাওয়া আসছে।

আচ্ছা, পুলিশ অফিসার তাদেরকে এরকমভাবে জেরা করল কেন? এদের কি ধারণা সিতির মৃত্যুর সঙ্গে বন্ধুদের কোনও সম্পর্ক আছে? কথাটা মাথায় আসতেই কীরকম যেন শিউরে উঠল সিদ্ধেশ।

কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? সিতি যখন মারা যায়, তখন তো তারা সবাই একসঙ্গে ছিল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তো প্রলয়েশদাকেও সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। অথচ পুলিশ যে প্রলয়েশদাকে সন্দেহ করছে সেটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওদের তো তাও ছেড়ে দিয়েছে, প্রলয়েশদাকে তো ছাড়লই না।

সামনের সিটটা খালি হতে বসে পড়ল সিদ্ধেশ। এখনও পাঁচ-ছ'টা স্টপেজ বাকি। বাড়ি ফিরে আগে ভালো করে স্নান করতে হবে। মায়ের কাছে মাইল্ড ঘুমের ওষুধ থাকে। ডাক্তারই দিয়েছে। মাঝে মাঝে খেতে হয়। আজ একটা খেয়ে নেবে, ভাবল সিদ্ধেশ। নাহলে রাতে ঘুম হবে না।

সিদ্ধেশ যখন বাসস্টপে নামল, তার পিছন পিছনই নামল চেককাটা জামা পরা লোকটা। সিদ্ধেশের সঙ্গেই বাসে উঠেছিল। একই অটোতে উঠল আবার। গলির মোড়ে সিদ্ধেশ নেমে গেল। লোকটা কিন্তু নামল না। মোড়টা ছাড়িয়ে অটোটা একটু এগোতেই বলে উঠল, এখানে একটু দাঁড়ান না ভাই। মনে হচ্ছে ছাড়িয়ে এসেছি। অনেকদিন আগে এসেছিলাম তো, ঠিক মনে নেই।

অটোওয়ালা একটু বিরক্ত হয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। খুচরো পয়সা হাতেই ছিল। ভাড়া দিয়ে চট করে নেমে যায় লোকটা। একটু পিছিয়ে এসে গলিতে ঢোকে।

সিদ্ধেশ ততক্ষণে গলির ভিতরে খানিকটা এগিয়ে গেছে। বেশ একটু দূরত্ব রেখেই পিছু পিছু যায়। দুটো বাঁক পেরিয়ে একটা দোতলা বাড়ির গেট খুলে ভিতরে ঢোকে সিদ্ধেশ।

নীচতলার লম্বা বারান্দায় আলো জ্বলছে। একজন মাঝবয়সি মহিলা বেরিয়ে এসে গ্রিলের গেটের তালা খুলে দেন। সিদ্ধেশ ভিতরে ঢুকে যায়। গেটের কাছাকাছি এসে বাড়ির নম্বরটা দ্যাখে লোকটা। তারপর মোবাইলে ফোন করে, দু-নম্বর সরাসরি বাড়ি এসেছে। যে ঠিকানা দেওয়া ছিল সেখানেই।

ঠিক আছে খেয়াল রাখো। বাড়ি থেকে বেরোলে ফলো করবে। মোবাইল, ল্যান্ড লাইন সব ট্যাপ করা আছে। বেরোনোর সম্ভাবনা দেখলে তোমাকে অ্যালার্ট করা হবে।

মেরুনকে ওর বাড়ির কাছাকাছি ড্রপ করে দিল মেঘনা। থানা থেকে বেরোনোর সময়ই মেরুন বলেছিল, তুই কি সরাসরি বাড়ি ফিরবি মেঘনা?

হ্যাঁ, কেন বল?

আমাকে যদি সল্টলেকের মুখটায় নামিয়ে দিস? এখন আর বাসে-ট্রামে উঠতে ইচ্ছে করছে না। পকেটে টাকাপয়সাও তেমন নেই।

অসুবিধা নেই। চলে আয়।

গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসে মেঘনা। পাশে উঠে বসে মেরুন। দরজা বন্ধ করে এসি চালিয়ে দেয় মেঘনা। আস্তে আস্তে হিম হিম ঠান্ডা হয়ে যায় ভিতরটা। মেরুনের মনে হয় তার মনের ভিতরটাও যেন অনেকটা মর্গের দেওয়ালের মতো নিষ্প্রাণ, কঠিন, ঠান্ডা হয়ে আছে।

গাড়ির কাচের ওপর জলের ফোঁটা পড়ছে সমানে। ওয়াইপারদুটো ক্রমাগত জল সরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মেঘনার মনে হচ্ছে কাচটা যেন মাঝে মাঝেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। পাশে মেরুন একদম চুপ। যেন একটা সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ। অসহ্য লাগে মেঘনার। নৈঃশব্দের পাঁচিলটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে।

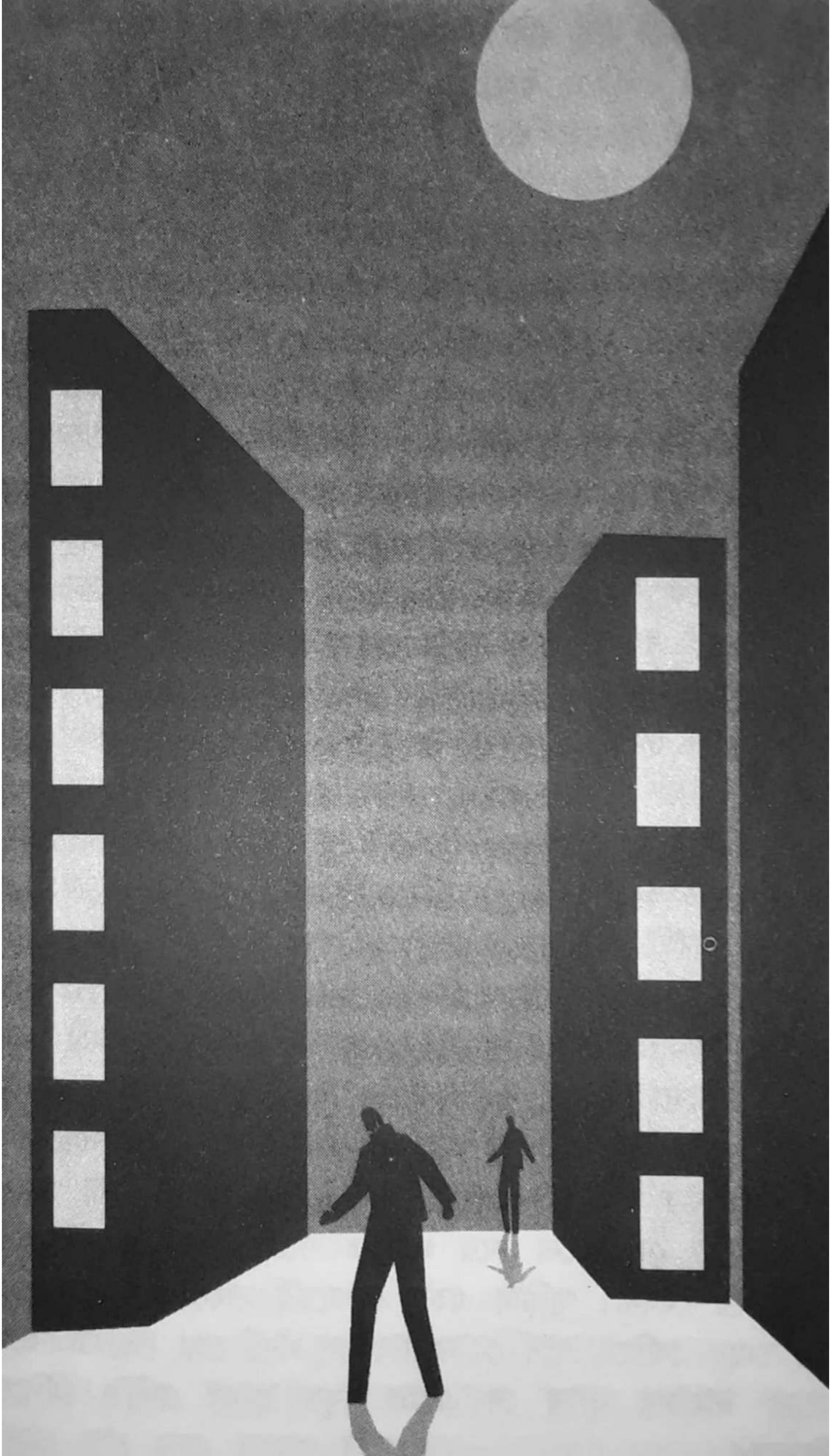
সবই কেমন দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে না রে?

মেঘনার কথায় অল্প ঘাড় নাড়ে মেরুন। কিন্তু ঠোঁট ফাঁক হয় না। ঠোঁটদুটো যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে শক্ত হয়ে আটকে আছে। গলায় শব্দ নেই। মেঘনারও কথা ফুরিয়ে যায়। নিঃশব্দে যান্ত্রিকভাবে গিয়ার বদলায়, অ্যাকসিলেটারে চাপ দেয়।

দুজনের কেউই লক্ষ করে না, মেঘনার গাড়িটা থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে আগে-পিছে দুটো মোটরসাইকেল আসছে। দুজনেরই মাথায় হেলমেট। একজনের গায়ে একটা ছাইরঙা জামা। অন্যজনের জামার রং হালকা বাদামি।

সল্টলেকের ক্রশিংয়ের কাছে এসে গাড়িটা দাঁড় করায় মেঘনা। আস্তে করে কাঁধে টোকা মারে মেরুনের। মেরুন যেন এতক্ষণ কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সম্বিত ফিরতে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি। দরজাটা বন্ধ করে গাড়িতে স্টার্ট দেয় মেঘনা। তার মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে ওঠে।

সল্টলেকের ক্রশিংয়ের কাছেই একটা সিগারেটের দোকানের পাশে



মোটরসাইকেলটা দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছিল হালকা বাদামি জামা। মেরুন রাস্তা পেরিয়ে একটা অটোতে ওঠে। বাড়ির কাছে নেমে একটা কোল্ড ড্রিংকস্ খায়। তারপর বাড়িতে ঢুকে যায়।

এক নম্বরের বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার খবরটা নির্দিষ্ট জায়গায় দিয়ে, লোকটা মোটরসাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

মেরুনকে যাই-ই বলুক, মেঘনা মনে মনে ঠিক করেছিল, আজ সে বাড়ি ফিরবে না। অন্তত এক্ষুনি তো নয়ই। বাড়ির ল্যান্ডলাইন নম্বর পুলিশকে দেওয়া আছে। সেখানে ফোন করে না পেলে কোনও সমস্যা হবে কি না, সেই ভাবনাটা মনের মধ্যে খিচখিচ করছিল। তবে সেটাকে গুরুত্ব দিতে চাইছিল না সে।

মেরুনকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নেবে ঠিক করেছিল। কিন্তু এখানে রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে। ইউ টার্ন বেশ খানিকটা গিয়ে। তাই সোজা চালাতে চালাতে হঠাৎ গাড়ির আয়নার দিকে চোখ পড়তেই মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে মেঘনার। ছাই রঙের জামা পরে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে যে লোকটা তাকে আগেও কয়েকবার দেখল না? নিশ্চিত হতে, গাড়ি না ঘুরিয়ে লেকটাউনের দিকে ঘুরে যায় মেঘনা। গাড়িটা দাঁড় করায় একটা কনফেকশনারির দোকানের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে আলগা চোখ বোলাতেই নজরে পড়ে মোটরসাইকেলও দাঁড়িয়ে পড়েছে। হেলমেট মাথায় আরোহী পান কিনছে। সন্দেহটা গাঢ় হয় মেঘনার। কিন্তু দোকান থেকে গোটা দুয়েক পেস্ট্রি কিনে বেরিয়ে এসে লোকটাকে আর খুঁজে পায় না।

ছাই রঙের জামা নজরে পড়ে না! তাহলে কি ব্যাপারটা মনের ভুল। একটু দোনোমনো করে গাড়িতে ওঠে, বাড়ি চলে যাওয়াই স্থির করে মেঘনা। গাড়িটা একটু এগোতেই সামনের বাসস্ট্যান্ডের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে মোটরসাইকেলে স্টার্ট দেয় লোকটা। ছাই রঙের জামাটার ওপর সে একটা সবুজ রঙের বর্ষাতি চাপিয়ে নিয়েছে।

চিন্নি মানে চিন্ময়ী কখনোই সাতে-পাঁচে থাকে না। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলাটাই যে তার অভ্যাস, এটা বন্ধুরা সবাই ভালোমতোই জানে। সিতির মৃত্যু এবং তার পরবর্তী ঘটনা তাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। থানা থেকে বেরিয়ে আর কারুর সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না চিন্নির। মনোহরপুকুরে একটা বাড়িতে সে পেইংগেস্ট থাকে। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছিল সেখানে।

বাড়ির মালকিন মালতী সরকার বয়স্কা বিধবা মহিলা। স্কুলের হেডমিসট্রেস ছিলেন। স্বভাবে কড়া হলেও অকারণ কৌতূহল নেই। যথেষ্ট সাহসীও। কাগজ এবং টেলিভিশন মারফত পুরো ঘটনাটাই তিনি জেনেছেন। কিন্তু চিন্নিকে মোটেই বিব্রত করেননি। বরং অকারণে এরকম একটা ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়ার জন্য তার প্রতি খানিকটা সহানুভূতিই দেখিয়েছেন।

আজও চিন্নিকে ফিরতে দেখে বললেন, গিজার অন করে দিয়েছি। আগে ভালো করে গরম জলে স্নান করে নাও। প্রতিমাকে বলে দিয়েছি চা আর টোস্ট দেবে।

ঘাড় নেড়ে নিজের ঘরে চলে যায় চিন্নি। দরজা বন্ধ করে জামা-কাপড় বদলায়। তারপর আলমারি খুলে জামাকাপড়ের পিছন থেকে একটা মোবাইল সেট আর সিম কার্ড বার করে। সিমটা লাগিয়ে মোবাইলটাকে ভাইব্রেশনে রেখে স্নানের ঘরে ঢোকে। স্নান সেরে জামাকাপড় পরতে পরতেই ফোনটা আসে,

বাড়ি ফিরে এসেছ?

হ্যাঁ।

পিছনে লোক আছে কিন্তু।

জানি, বুঝতে পেরেছি।

আজই ওটা কালেক্ট করতে হবে। ডেস্টিনেশনে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টালবাহানা করছে। কাল সকালে আলাদা যাবে বলছে। আর সময় দেওয়া যাবে না।

ঠিক আছে, আমি বেরোচ্ছি। তবে আধঘণ্টা পরে।

নো প্রবলেম। সাবধানে। কোথায় যাচ্ছ যেন বুঝতে না পারে।

চিন্তা কোরো না।

ফোনটা অফ্ করে দিয়ে আবার আগের জায়গায় রাখে চিন্ময়ী।

খাওয়ার ঘরের টেবিলে চা দিয়ে গেছে প্রতিমাদি। টোস্ট চিবোতে চিবোতে চায়ে চুমুক দেয় চিন্নি। তারপর মালতী সরকারকে বলে, আন্টি আমাকে একটু বেরোতে হবে।

এখন আবার বেরোবে? কেন?

বাবা ফোন করেছিলেন। ওঁরা খুব দুশ্চিন্তা করছেন। বাবার এক বন্ধু আছেন, ল-ইয়ার। নাম-টাম আছে বেশ। তো বাবা বলছেন আজই গিয়ে ওনার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে। বাবা নিজে ফোন করে ব্যাপারটা বলেওছেন।

তাহলে ঘুরে এসো। পুলিশের ব্যাপার তো। উকিলের সঙ্গে কথা বলে রাখাই ভালো। ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?

কাছেই, ঢাকুরিয়ায়।

চা শেষ করে ঘরে গিয়ে পোশাক বদলায় চিন্নি। জিন্‌স আর সাদার ওপর নীল রঙের ফুল ফুল ছাপ দেওয়া কুর্তা। আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হয়, কুর্তাটা একটু বেশিই ঢিলে। অল্প ভেবে নীল রঙের একটা সিল্কের কর্ড কোমরে বেঁধে নেয় চিন্নি। প্রিয়া সিনেমার উলটোদিক থেকে অটো ধরে সোজা এসে নামে রাসবিহারী মেট্রো স্টেশনের সামনে।

চার নম্বরকে হারিয়ে ফেলেছি স্যার।

ফোনে খবরটা শুনে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন অনঙ্গ দেব, হারিয়ে ফেলেছ মানে? তোমাকে না বলা হয়েছিল, এক সেকেন্ডের জন্য মেয়েটাকে চোখের আড়াল না করতে?

সেই চেষ্টাই করছিলাম স্যার। কিন্তু মেয়েটা পুরো ভড়কি দিয়ে দিল।

বাজে কথা বোলো না বিশু। মেয়েটা একেবারে সাধাসিধে। ভয়ে জবুথবু হয়েছিল। ভড়কি দেওয়ার জিনিসই নয়।

আমার মনে হয় না স্যার। মেয়েটাকে দেখে ওরকম মনে হয়, কিন্তু আসলে অন্য জিনিস। আমাকে পুরো টুপি দিয়ে দিল।

বাজে কথা রেখে, কী হয়েছে পুরোটা বলো শুনি।

মেয়েটা স্যার সোজা ট্যাক্সিতে বাড়ি এসেছিল। আমি তো পিছনেই ছিলাম। কোথাও নামেনি, দাঁড়ায়নি। তারপর এই ধরুন সাড়ে সাতটা নাগাদ দেখি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। পেছু ধরলাম। অটো নিয়ে রাসবিহারী মেট্রো স্টেশনে নামল। আমিও নামলাম। টিকিট কেটে পিছন পিছন ভিতরে ঢুকলাম। একটু পরেই গড়িয়ার দিকের একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল আর মেয়েটাও উঠে পড়ল। আমিও উঠলাম স্যার, একই কামরায়। ট্রেনটা তখনও ছাড়েনি, এমন সময় দমদমের দিকের একটা ট্রেন এসে উলটো দিকে দাঁড়াল। আর কী বলব স্যার, লাস্ট মোমেন্টে মেয়েটা চট্ করে নেমে উলটোদিকের ট্রেনে উঠে পড়ল।

আমিও নামতে গেলাম স্যার। কিন্তু তার আগেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমার কীরকম মনে হল স্যার, মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল অনঙ্গ দেবের। বিশুটা একটা আহাম্মক। মনে মনে কথাটা বলেও অবশ্য একটা ঢোঁক গিলতে হল। বিশু যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে চিন্ময়ীকে বুঝতে তাঁদের সকলেরই ভুল হয়েছে।

কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? ওর মোবাইলটা এক্ষুনি ট্র্যাক করা দরকার। যতক্ষণ মেট্রোয় মেয়েটা আছে, ততক্ষণ কিছু করা যাবে না। নামলেই ধরতে হবে।

ধর্মতলাগামী মেট্রোয় উঠে একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়ে চিন্নি। ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বার করে। একটা মেসেজ এসেছে। চেনা নম্বর। মেসেজটা খুলে দেখে, লেখা আছে রাজপুতানি নারী। কয়েক সেকেন্ড মেসেজটার দিকে ভুরু কুঁচকে থাকে চিন্নি। তারপর

মোবাইলটা সুইচ্ অফ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলে।

ট্রেনটা পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে এসে দাঁড়ালে নেমে পড়ে চিন্নি। ওপরে এসে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে। আটটা বেজে গেছে। বৃষ্টিও পড়ছে টিপটিপ করে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। পার্ক স্ট্রিটের এই দিকটাতে বহু পুরোনো কয়েকটা আবাসন আছে। কিছু ফ্ল্যাটে অফিস হয়। বেশিরভাগই রেসিডেন্সিয়াল। তবে ব্যাপারটা বেশ দোআঁশলা। পার্সি, খ্রিস্টান, হিন্দু সব মিলেমিশে থাকে। অবাঙালির সংখ্যাই তুলনায় বেশি।

খানিকটা হেঁটে এরকমই একটা আবাসনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে চিন্নি। এই বাড়িগুলো আধুনিক বহুতলের মতো নয় মোটেই। বাড়িটার গঠনটা অনেকটা ইংরেজি দুই-এর মতো। আটতলা বাড়ি। ওপরে ওঠার জন্য বাড়ির চার অংশে চারটে লিফ্টের ব্যবস্থা আছে।

একটু সতর্কভাবে লক্ষ করতে করতে এগোয় চিন্নি। এক আর দুই নম্বর লিফ্টের সামনে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিন নম্বর শুনশান। ফাঁকা লিফ্টটা নীচে দাঁড়িয়ে আছে। লিফ্টম্যান নেই। চট্ করে ভিতরে ঢুকে কোলাপসিবলটা টেনে দেয় চিন্নি। আট নম্বর বোতামটা টিপতেই ঝড়াং ঝড়াং শব্দ করে চালু হয়ে যায় পুরোনো আমলের লিফ্ট। একেবারে এসে থামে আটতলায়।

লিফ্ট থেকে নেমে একবার চারপাশটা দেখে নেয় চিন্নি। তিনটে দরজা। তিনটেই বন্ধ। সাড়াশব্দও নেই। বৃষ্টিতে ভিজে মেঝে। ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে, দুটো নীচু পাঁচিল টপকে বাড়িটার একেবারে সামনের অংশে চলে আসে চিন্নি। সেখানে আর একটা সিঁড়ির মুখ। লিফ্টের দিকে না এগিয়ে সিঁড়ি বেয়েই সন্তর্পণে নেমে আসে ছয়তলায়। সেগুন কাঠের বিশাল দরজার ওপর একটা ডোকরার মুখোশ আটকানো। বেল টেপে চিন্নি। ম্যাজিক আই দিয়ে তাকে দেখে নিয়ে দরজা খোলে দারুণ সুন্দরী এক মহিলা। সিল্কের মতো লম্বা চুল নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। মাখন রঙা ত্বক। পানপাতার মতো নিখুঁত মুখের গড়ন। তবে প্রসাধনহীন মুখের দিকে তাকিয়ে

বোঝা যায়, বয়স প্রায় চল্লিশ ছুঁয়েছে। পরনে একটা লাল-কালো কিমোনো ধরনের পোশাক। আঙুলে বেশ বড়সড় একটা পাথর বসানো আংটি।

কী রে তুই এত রাতে? ভিজে গেছিস তো। আয় আয় ভিতরে।

মহিলার পিছন পিছন ভিতরে ঢোকে চিন্নি। জুতোটা খুলে রাখে পাপোশের ওপর।

ছোট একটা করিডর পেরিয়ে বসার ঘর। দামি বাহারি সোফাসেট দিয়ে সাজানো। কোণে একটা মাথায় বেতের টোপর পরানো লম্বা স্ট্যান্ড ল্যাম্প। দামি বাহারি আলো বিছিয়ে আছে ঘরময়। চিন্নিকে বসতে বলে মহিলা একটা তোয়ালে এনে দেয়। মাথা মুছে নিয়ে চিন্নি বলে, বড্ড খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খাবার আর এক কাপ কফি খাওয়াও। তারপর সব বলছি। আজ সারাদিন যা গেছে...বলার নয়।

তুই রিল্যাক্স কর। আমি খাবার গরম করে আনছি। খেতে খেতে শুনব।

ভিতরে চলে যান মহিলা। চিন্নি দ্রুতহাতে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা মহিলার মোবাইলটা সাইলেন্ট করে দেয়। ল্যান্ড লাইনের ফোনের রিসিভারটা ক্রেডেল থেকে এমনভাবে তুলে রাখে, যাতে রিং হলেও শোনা না যায়। তারপর রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দরজার দিকে পিছন করে গ্যাস ওভেনের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার গরম করছেন মহিলা। কোমর থেকে সিল্কের কর্ডটা খুলে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় চিন্নি।

আচ্ছা ওই কালো হন্ডাই গাড়িটা তুমি কোথায় দেখছ বলো তো?

পার্ক স্ট্রিটে স্নিগ্ধাদের ফ্ল্যাটে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্নিগ্ধাকে প্রশ্নটা করেন বিকাশ দত্ত।

রীতিমতো ছড়ানো বড়সড় ফ্ল্যাট। স্নিগ্ধার বাবা একটি বহুজাতিক সংস্থায় উঁচু পদে কাজ করেন। সেই সূত্রেই এখানে থাকার ব্যবস্থা।

ওই গাড়িটা আমাদের ক্যাম্পাসের ভিতরেই মাঝে মাঝে দাঁড় করানো থাকে তো।

তুমি কি রোজই ওটাকে দেখতে পাও?

না রোজ না, তবে মাঝে মাঝে দেখি।

গাড়ি নম্বরটা মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ তো, ডব্লু বি জিরো টু সেভেন নাইন টু নাইন।

গাড়িটা কার তুমি জানো?

না তো। আসলে আমি কোনওদিন গাড়িটা কাউকে চালাতে দেখিনি। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখেছি। শুধু সেদিন, যেদিন অর্ককে তুলে নিয়ে গেল, সেদিন ওটাকে রাস্তায় দেখেছিলাম। কিন্তু কে চালাচ্ছিল, তাকে দেখতে পাইনি।

আচ্ছা স্নিগ্ধা, তুমি যে গাড়িটাকে বেশ মন দিয়ে লক্ষ করতে সেটা তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন?

পারটিকুলারলি ওই গাড়িটাকেই তুমি আইডেন্টিফাই করেছিলে কেন? তুমি কি গাড়ি নিয়ে ইন্টারেস্টেড, মানে কোনটা কী গাড়ি, তার কী বৈশিষ্ট্য, সেটা মন দিয়ে দ্যাখো?

মোটেই না।

কথাটা বললেন স্নিগ্ধার বাবা মহীয়ান সেন। পাশের সোফায় বসে এতক্ষণ তিনি মন দিয়ে দুজনের কথোপকথন শুনছিলেন।

ইনফ্যাক্ট হ্যারি পটার পড়া আর টেলিভিশনে কার্টুন দেখা, এ ছাড়া আমার মেয়ের আর কোনও বিষয়ে কোনও ইন্টারেস্ট আছে বলে তো আমরা অন্তত জানি না।

তাহলে?

বিকাশ দত্তের প্রশ্নটা শুনে স্নিগ্ধা একটু ভয়ে ভয়ে একবার বাবার দিকে তাকাল। তারপর বলল, আসলে ওটা আমার লাকি গাড়ি। স্কুল যাওয়ার সময় ওটা দেখলে দিন ভালো যায়। একদিন ম্যাথ ক্লাস টেস্টের দিন ওটা দেখে গিয়ে টুয়েন্টি আপ অন টুয়েন্টি পেয়েছি। তাই ওর নম্বরটা আমার মুখস্থ...

বুঝুন ব্যাপার...একটা গাড়ি, তাও আবার অন্যের, সেটা হল

গিয়ে লাকি।

হাত উলটে বলেন মহীয়ান সেন।

মিঃ সেন, আমার মনে হচ্ছে এবার আপনার সাহায্য দরকার হবে।

হ্যাঁ নিশ্চয়, কী করতে হবে বলুন?

বিকাশের কথায় নড়েচড়ে বসেন মহীয়ান সেন।

স্নিগ্ধার কাছে গাড়ির নম্বরটা জানা গেছে। গাড়িটা যখন চত্বরের ভিতরেই থাকে, তখন আশা করা যায় মালিকও এখানকারই বাসিন্দা। বিল্ডিং-এর সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে কথা বললেই জানা যাবে গাড়ির মালিক কে। তারপর তাঁর সঙ্গে একটু মোলাকাত করতে হবে।

বেশ তো, চলুন।

বিকাশ দত্ত এবং মহীয়ান সেন নীচে নেমে আসেন। নিজের পরিচয় দিয়ে গার্ডদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেই বিকাশ জানতে পারে, গাড়িটা এক মহিলার। তিনি বিল্ডিংয়ের সামনের অংশের ছয়তলায় থাকেন। যে ফ্ল্যাটে থাকেন, সেটা আসলে গোমেজদের। গোমেজরা বহুদিন ধরেই বিদেশে। বছর দুয়েক অন্তর এক-আধবার আসে। মাস দুয়েক আগে পিটার গোমেজ ফোন করে কেয়ারটেকারকে বলে দিয়েছিলেন যে এই মহিলা তাঁদের ফ্ল্যাটে মাস ছয়েক থাকবেন। তারপর থেকেই উনি আছেন। ফোনে গোমেজ মহিলার নামও বলেছিলেন, কিন্তু সেটা সে ভুলে গেছে।

গেটের সিকিওরিটি জানাল মহিলা ফ্ল্যাটে একাই থাকেন। মাঝে মাঝে এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে আসেন। তার মুখ চেনা। আর কেউ কখনও এসে থাকলেও সে বলতে পারবে না।

লিফটম্যানও ওই একজন ভদ্রলোকের কথাই বলল। উনিই মোটামুটি নিয়মিত মানে সপ্তাহে কিংবা দশদিনে একদিন আসেন। তবে গত দু-তিনদিনে যে আসেননি সে বিষয়ে লিফটম্যান অন্তত নিশ্চিত। মহিলা নিজেই গাড়ি চালান। বেশিরভাগ দিন সকালের দিকে বেরোন। দুপুরের পর বাড়ি ফিরে আসেন। মাঝে মাঝে সন্ধের

পরও বেরোন। আজ বারোটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। সন্ধেয় ফিরে এসেছেন। গাড়িটা চত্বরের ভিতরেই পার্ক করা আছে।

লিফ্‌টম্যানের কাছে জানা গেল, মহিলার বাড়িতে ঠিকে কাজ করে একটি বউ। এ ছাড়া আর কোনও কাজের লোকজন নেই।

কালো হুডাইটা বাইরে থেকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বিকাশ দত্ত সিকিওরিটিকে বললেন, আমি একবার ওনার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আপনি চলুন ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দেবেন। মিঃ সেন, আপনিও প্লিজ সঙ্গে চলুন। অচেনা মহিলা, রাত-বিরেতে যাচ্ছি...

তিনজনে যখন ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে পৌঁছোল, তখন ঘড়িতে রাত ঠিক সাড়ে ন'টা। সিকিওরিটি গার্ড বেল টিপল। জলতরঙ্গের আওয়াজ শোনা গেল ভিতর থেকে। কিন্তু মিনিট তিনেক কেটে যাওয়ার পরও কেউ দরজা খুলল না।

বার তিনেক বেল টেপার পরও কেউ দরজা খুলল না দেখে, দরজায় চাপ দিলেন বিকাশ দত্ত। হালকা চাপেই খুলে গেল ভারী সেগুন কাঠের দরজা। চমকে উঠলেন বিকাশ। বাকি দুজনকে সিঁড়ির ধারের দিকে সরে যেতে বলে কোমর থেকে রিভলভার বার করে সাবধানে ভিতরে ঢুকলেন।

করিডর পেরিয়ে পরিপাটি সাজানো বসার ঘর। সেটা পেরিয়ে একটু এগোতেই চোখে পড়ল ভয়ানক দৃশ্য। রান্নাঘরের ভিতরে মেঝেতে পড়ে আছে এক মহিলার দেহ। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। গলায় লাল দাগটা থেকে মৃত্যুর কারণও স্পষ্ট। মৃত্যুর বিভীষিকা সত্ত্বেও মহিলা যে অপূর্ব সুন্দরী, বুঝতে কষ্ট হয় না।

সাবধানে বাকি ঘরগুলো দেখে বেরিয়ে আসার সময় বিকাশের চোখে পড়ে বসার সেন্টার টেবিলের ওপর পড়ে আছে মস্ত একটা পাথর বসানো আংটি। আংটিটা হাতে তুলে নিতেই চোখে পড়ে পাথরের নীচটা আসলে একটা ঢাকনা লাগানো ছোট্ট কৌটো। অনেকটা যে ধরনের বিষের কৌটো বসানো আংটি থাকত রাজপুত রানিদের কাছে। এই আংটির কৌটোটা অবশ্য এখন খালি।

৮

সিদ্ধেশের ঠাকুরদার সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে আবার জড়ো হয়েছে ওরা। ওরা মানে সিদ্ধেশ, চিন্নি, মেঘনা আর মেরুন। প্রলয়েশ পুলিশের হেফাজতে। তাই ওর না থাকাটাই স্বাভাবিক। আর সিতি, সিতি তো এই সব কিছুর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ওরা চারজন আবার এক হয়েছে, কিছুটা সেই প্ল্যানচেটের দিনের মতন।

তবে অনেক কিছুই বদলে গেছে তার মধ্যে। টেবিলটা একই আছে কিন্তু সিলিংয়ের পাখাটা আজ চলছে না। নাহ্, খারাপ হয়নি, কেউ চালায়নি বলেই চলছে না। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, তাই একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব।

পুতুলের পুড়ে যাওয়া ছাই, ফুলের পাপড়ি, সিঁদুর সব বজরঙ্গিদা আর ওর বউ মিলে পরিষ্কার করে ফেলেছে। প্ল্যানচেট বোর্ড বা কাগজ পেনসিলগুলোও নেই, রয়েছে শুধু মুড়ি মাখা বাটিগুলো। বজরঙ্গিদাই নিয়ে এসেছে। যদিও খাওয়ার কারও কোনও ইচ্ছে আছে বলে মনে হচ্ছে না। সবার চোখের মধ্যে শুধু সেদিনের ঘটনাগুলো ঘুরছে সিনেমার মতন।

মেরুনই প্রথম কথা বলল, ওর গলায় বিরক্তি, 'আমাদের এখানে ডেকেছিস কেন?'

ওর কথার ধরনে একটু ধাক্কা খেল সিদ্ধেশ, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়েই বলল, 'আগে বল তোর পিছনে যে টিকটিকি লেগে রয়েছে তাকে ধোঁকা দিয়ে আসতে পেরেছিস কি?'

মেরুন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল, 'সে আবার এমন কী শক্ত কাজ! লোকটা নেহাতই বোকা! শুধু আমি কেন, চিন্নি, মেঘনা সবাই ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে।'

চিন্নি বিদ্রুপ করে বলল, 'তোর মনে হয় ওই পা নিয়ে ল্যাজ খসাতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই তুই ওই প্রশ্ন করছিস! আমাদের কাছে

ওটা এখন জলভাত, রোজ দুবেলা করছি।'

ছলাৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল সিদ্ধেশের। চিন্নি যেন কেমন বদলে গেছে! এইরকমভাবে কথা বলতে ওকে কখনও শোনেনি সিদ্ধেশ!

মেরুন বাধা দিল, 'আহ্, চিন্নি! কী হচ্ছেটা কী!, ওইরকম ব্যক্তিগত ইনসাল্ট করছিস কেন সিদ্ধেশকে!'

চিন্নি মাথা নীচু করে ফেলল, 'সরি! যা সব ঘটছে, এর পর আর আমার মাথার ঠিক নেই!'

মেরুন শুধু বলল, 'হুঁ!'

সবাই গুম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রাগ হজম করে ফেলে সিদ্ধেশই মুখ খুলল, 'সেই জন্যেই তোদের ডেকেছি এখানে। আমাদের আগেই একজোট হওয়া উচিত ছিল যাতে আমরা পুলিশকে একই রকম বিবৃতি দিতে পারি। আলাদা আলাদা রকম কথা বললে সন্দেহটা আমাদের ওপর এসে পড়বে আর ওরা ক্রমাগত আমাদের জ্বালাতে থাকবে। সিতি তো আমাদের বন্ধু ছিল, আমরা তো ওর কোনো ক্ষতি চাইনি!"

'ঠিক বলেছিস! ওদের তো ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি, তাই আমাদের সবাইকে আলাদা আলাদা ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কেউ কোনও বেফাঁস কথা বললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা কে কী বলছি সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যে যাচাই করে নেওয়া উচিত!'

মেরুন সায় দিল।

'ওই অনঙ্গ দেব লোকটা ডেঞ্জারাস!' মেঘনা মুখ ভেঁচকে বলল।

চিন্নির মুখ কঠিন, 'আমাদের মধ্যে যে সবাই সত্যি কথা বলছে এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই! নিজের গা বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে বলাটাই স্বাভাবিক!'

'কী বলতে চাইছিস তুই?' ফোঁস করে উঠল মেঘনা।

'ঠিকই বলছি! সিতি যেদিন মারা যায় সেদিন তুই ওর বাড়ি গিয়েছিলি। কেন সেটা একবারও আমাদের বলেছিস?'

মেঘনার চোখ ছোট হয়ে গেছে, ঘরে ছুঁচ ফেললেও তার শব্দ শোনা যাবে!

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম! ওকে এখান অবধি লিফট দেব মনে করে গিয়েছিলাম। দরজা ধাক্কা দিয়েছিলাম, ও খোলেনি। তাই ও বাড়িতে নেই মনে করে চলে এসেছিলাম। সেটা নিয়ে এত চেল্লামেল্লির তো কিছু নেই! আমি সেটা মোটেও লুকোচ্ছি না, তবে ছাদে উঠে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করার মতনও তো কিছু দেখছি না!'

মেরুন বলল, 'অন্তত আমাদের তো কথাটা আগে বলতে পারতিস! সিতির মৃত্যুর দিন তোর ওই অ্যান্টিভাইরাসের ক্যাশমেমোটা ওর বাড়িতে পেয়ে আমাদের কী মনের দশা হয়েছিল একবার ভেবে দেখ!'

মেঘনা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, চেয়ারটা উলটে ফেলে দিয়ে, 'তোরা কি আমাকে সন্দেহ করছিস? তোরাও যে সব ধোওয়া তুলসীপাতা নোস সেটা আমিও ভালোই জানি! বিকাশদা আমাকে অনেক কিছু বলেছে!'

'ও বাবা! বিকাশ দত্ত, জুনিয়ার সি আই ডি অফিসার আবার বিকাশদা হয়ে গেল কবে থেকে? কী বলেছে সে শুনি!'

'বলব কেন! তোরা কিছু বলিস আমাকে? সিতির পায়ের গোড়ালিতে অপারেশান করে মেটাল ক্যাপসুল ঢোকানো ছিল, সেটা তোরা জানতিস। কিন্তু কই, আমাকে বলিসনি তো! সিতিটাও আমাকে কিছু বলত না। একবার যদি জানতাম যে প্রলয়েশদা ওকে ব্ল্যাকমেল করছে তাহলে কোনওমতেই ওর ওই ভুয়ো প্ল্যানচেটের আসরে আসতে রাজি হতাম না!' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেঘনা।

সিদ্ধেশ ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'থাক, অনেক হয়েছে! আর একদম কোনও কথা বলবি না! তোদেরকে আমি আর আদৌ বন্ধু বলে মনে করি না, তোরা সব হলি নরকের কীট!' বলে হনহন করে হাঁটা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। সিদ্ধেশ উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখল লাল রঙের হুন্ডাই আই টেনটা তখন ওদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

‘এইভাবে মিট করাটা একটা জঘন্য প্ল্যান, সেটা এখন বুঝতে পারছি!’ মেরুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

‘গেছে ভালো হয়েছে! আপদ বিদায় হয়েছে! পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রাজসাক্ষী হওয়ার চেষ্টা করছে! আমরা যা বলব সব রিপোর্ট করবে ওদের কাছে! ওর ওই মায়া কান্না আমার খুব চেনা আছে!’ চিন্নি কঠিন স্বরে বলল।

সিদ্ধেশ বেশ ভেঙে পড়েছিল। মেঘনাকে তার বরাবরই ভালো লাগে। সে কাতরভাবে বলল, ‘কেন তোরা ওইরকম বলছিস? আমি তো আমাদের সকলের ভালো চেয়েই এটা করতে চেয়েছিলাম!’

‘আমাদের ভালো চেয়ে না মেঘনার ভালো চেয়ে? ওর প্রতি তোর যে একটা সফ্‌ট কর্নার আছে, সেটা আমরা জানি না ভাবছিস? ওই ক্যাশমেমোটা মেঘনার নামে; তাই তুই ভাবছিলি পুলিশ ওকে সিতির খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করছে। তা ছাড়া সেই প্রথম প্ল্যানচেটের দিন মেঘনাই সব চাইতে দেরি করে এসেছিল মনে নেই? আমরা সবাই অনেক আগে থেকে এসে অপেক্ষায় বসেছিলাম। তুই মিটিং ডেকেছিস তোর নিজের স্বার্থে আর মেঘনাকে বাঁচাতে!

‘একটা কথা মেঘনা ঠিকই বলেছে, তোরা কেউ বন্ধু হওয়ার যোগ্য নোস! বড্ড স্বার্থপর তোরা! আমাকে আর ফোন বা এস.এম.এস. করার চেষ্টা করিস না! এই শেষ, এবার যে যার নিজের মতন!’ বলে চিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে নিজের ব্যাগটা তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে মেরুনের দিকে তাকাল সিদ্ধেশ, ‘কী হবে রে মেরুন?’

‘কী আবার হবে? শুনলি না যে যার নিজের মতন! যাই, আমিও এবার নিজের দিকটা সামলাই! এসব মিটিং-টিটিং আর করতে যাস



না! কথায় বলে না আগ বাড়িয়ে কারো ভালো করতে নেই, অর্থাৎ ভালাই কা জামানা নেহি রাহা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম! তা ছাড়া এই রকম প্রবল মানসিক চাপ পড়লে অনেক নিকট সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে যায়। তাই বন্ধুত্ব ভেঙে গেলে আশ্চর্য হোস না! চললাম রে! টিকটিকি হইতে সাবধানে থাকিস!' বলে মেরুনও বেরিয়ে গেল।

বজ্রাহতের মতো একা বসে রইল সিদ্ধেশ।

আধ খাওয়া চায়ের কাপটায় চুমুক দিয়ে মুখ বেঁকালেন অনঙ্গ দেব। জঘন্য খেতে। চা-ওয়ালার অবশ্য দোষ নেই। চা-টা ঘণ্টা দুয়েক ধরে পড়ে রয়েছে টেবিলে। তাই বিস্বাদ তো হবারই কথা!

ক'দিনের নিম্নচাপ কেটে গিয়ে বাইরে হালকা রোদের একটা রেখা দেখা দিচ্ছে মাঝে-মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে। বৃষ্টিটা থেমেছে সেটাই রক্ষে। তবে আবহাওয়া দফতর থেকে বলছে আরেকটা নিম্নচাপ নাকি আসছে শীঘ্রই। তাই শুনে মেজাজটা খিঁচড়ে আছে ওনার। সকালে উঠে এমনিতেই সূর্যের মুখ না দেখতে পেলে মুড অফ হয়ে যায়। তার ওপর যদি এইরকম পেঁচালো একখানা কেস হাতে থাকে তাহলে তো কথাই নেই! মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে সমাধান হবে তো কেসটার? সামনে বসে থাকা বিকাশ দত্তকে অবশ্য তিনি মানসিক অবস্থা একেবারেই বুঝতে দিচ্ছেন না।

'হ্যাঁ, বলো বিকাশ, কী কী জানতে পারলে?'

'মৃতার নাম অনামিকা সাহা, বয়স একচল্লিশ। নামটা মা-বাবার দেওয়া নাম কি না জানি না, তবে ওই নামটাই উনি পার্ক স্ট্রিটের আবাসনে থাকার সময় ব্যবহার করছিলেন। আগের কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে অন্য নামে কুকীর্তি করে থাকলে সেটা খুঁজে বার করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

উনিই যে অর্কর রক্তিমদা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওনার

কম্পিউটারটা আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল মহিলা যথেষ্ট বিত্তশালী। শরীরস্বাস্থ্যের যত্ন নিতেন ভালো। বেশ কিছু ভিটামিন ক্যাপসুল-ট্যাপসুল পেয়েছি আর জামাকাপড়, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি সবই দামি ডিজাইনার ব্র্যান্ড। বাড়ি-ঘর রুচিশীলভাবে সাজানো। গাড়ি , কম্পিউটার, কাজের লোক সব মজুত অথচ উনি ঠিক কী করতেন কেউ জানে না! অবশ্য এমনও হতে পারে উনি পৈত্রিক সূত্রে অনেক টাকা পেয়েছেন এককালে, তাই পয়সার অভাব নেই।

যাই হোক, ওনার কাছে যে লোকটা আসত তাকে ট্র্যাক করার চেষ্টা চলছে, এখনও অবধি নো নিউজ। সে মনে হয় ব্যাপারটা আঁচ করে গা ঢাকা দিয়েছে। কাজের মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছি। সে কিছুই জানে না, সময়ে বেতন পেয়ে যেত প্রতি মাসে আর মহিলা ওর সঙ্গে কোনওদিন বাজে ব্যবহার করেননি এইটুকুই।

'আংটিটাকে ল্যাবে পাঠিয়েছি, দু-এক দিনের মধ্যেই রিপোর্ট এসে পড়বে। আমার মন বলছে হেভি মেটালের ছোঁওয়া পাওয়া গেলেও যেতে পারে। ও ভালো কথা, গলায় ফিতে বা রিবন জাতীয় কিছু একটা পেঁচিয়ে খুনটা করা হয়েছে অর্থাৎ "ডেথ বাই স্ট্র্যাঙ্গুলেশান" সেটা কনফার্ম করেছেন ডাক্তার। বেশ ভালো শক্তির প্রয়োজন। আর এনার পায়ের গোড়ালি থেকেও একটা মেটাল ক্যাপসুল উদ্ধার হয়েছে।'

অনঙ্গ দেব কাচের ভারী পেপারওয়েটটাকে হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছিলেন। মান্ধাতার বাবার আমলের জিনিস। এগুলো এখন আর কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হয় না। বিকাশের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'আসল খবরটা চেপে যাচ্ছ কেন বিকাশ, সেটা বলো!'

'উফ্, লোকটার কী চোখ রে বাবা! সব কিছু যেন বুঝতে পেরে যায়!' বিকাশ দত্ত ভাবতে থাকেন, 'সেই জন্যেই এত উঁচু পদে উঠতে পেরেছেন। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে অনেকটাই বেশি।'

'না, মানে চাঞ্চল্যকর খবরটা শেষের জন্যে রাখছিলাম স্যার! তার আগে চট করে বলে রাখি, আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী অবশিষ্ট চার বন্ধুর মধ্যে তুলকালাম লেগে গেছে।'

'ভেরি গুড! তাহলে মিলেমিশে গল্প বানাবে না। আর কী বলো।'

"ওই পার্ক স্ট্রিটের বাড়িটার বাসিন্দাদের সঙ্গে আমরা এক্সটেন্সিভলি কথা বলেছি কেউ যদি কিছু দেখে থাকে জানার জন্যে। বেশির ভাগই কিছু দেখেনি বা শোনেনি। তবে একটা ছেলে, নাম নবীন কেজরিওয়াল, বয়স সতেরো, মা-র সঙ্গে ঝগড়া করে ছাদে গিয়ে বসেছিল। সে বলল ছাদে একটা মেয়েকে দেখেছে। ফুল ফুল করা কুর্তি পরা। স্যার, ওর ডেসক্রিপশান একেবারে বিশুর দেওয়া বিবরণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মালতী সরকারও প্রথমে মুখ খুলতে চাননি। কিন্তু পরে খুনটুন শুনে বলেছেন ওই নীল-সাদা ফুল ফুল কুর্তিটার কথা। যদিও অনামিকা দেবীর ফ্ল্যাট থেকে সব হাতের ছাপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তাও চিন্নিকে আমরা গ্রেফতার করছি স্যার।'

বাড়ি ফিরে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে জিনিস বার করতে গিয়ে দলা পাকানো কাগজটা দেখে বেশ অবাক হল সিদ্ধেশ। এটা আবার কোথা থেকে এল? কে ঢোকাল। হুমকি নাকি? কাগজটাকে সোজা করতে লেখাগুলো দেখতে পেল সে।

'মন খারাপ করিস না। ঝগড়াগুলো সব মেকি। আমাদের বন্ধুত্ব কি অত ঠুনকো নাকি! ব্যাটা টিকটিকিরা আমাদের ফোন ট্যাপ করছে, পিছু নিচ্ছে, চারিদিকে যন্ত্র লাগিয়ে আমাদের কথা শুনছে, কিছুই আর বাকি নেই! তোর ঠাকুরদার বাড়িতেও ওদের যন্ত্র মজুত, তাই ভাবলাম ওদের সঙ্গেও একটু মশকরা করা যাক। ভাবুক না আমরা ঝগড়া করছি। দেখি ওদের দৌড় কত দূর! কোথায় সিতির খুনিকে ধরবে, তা না খামোকা আমাদের পিছনে

লেগে সময় নষ্ট করছে!...'

চিঠিটা পড়ে যত্ন করে ভাঁজ করে অক্সফোর্ডের ডিকশনারিটার মধ্যে রেখে দিল সিদ্ধেশ। গুনগুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে খাবার ঘরের দিকে চলল। একটু আগেই নিজেকে ক্লান্ত, অবশ লাগছিল। এখন আর লাগছে না।

দৈনিক সংবাদপত্র (পঞ্চম পৃষ্ঠা)
বিস্ফোরণের আগুনে
গবেষণাগার পুড়ে ছাই, মৃত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তের নিকটবর্তী পর্যটন কেন্দ্র তালসারির কাছে অবস্থিত একটি গবেষণাগারে আজ বিস্ফোরণ ঘটায় সেখানকার দুই কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় পুলিশ। মৃতদেহগুলি আগুনে এতটাই ঝলসে গেছে যে তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োগশালাটি কে এম ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি বিদেশি সংস্থার ছিল বলে জানা গেছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে শক্তিশালী এই বিস্ফোরণের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন আশপাশের বাসিন্দারা। কে এম ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনও ফল হয়নি। নষ্ট হয়ে যাওয়া গবেষণাগারে কী ধরনের কাজ হত সেটা বলতে রাজি হননি কে এমের কর্তৃপক্ষ। গবেষণাগারটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, দমকলের লোকজন চেষ্টা করেও ভয়াবহ আগুন নেভাতে পারেনি। ল্যাবরেটরিটার ঠিক ধারেকাছে কোনও বাড়ি-ঘর ছিল না। তাই পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পুলিশ বিস্ফোরণের কারণ আর মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে।

৯

ওড়িশা পুলিশ আর এনআইএ-এর পাঠানো কয়েকটা রিপোর্টে চোখ বুলিয়েই গম্ভীর হয়ে যান মধুবন্তী সেন। ডিআইজি সিআইডি। সিনিয়র আইপিএস। দক্ষতার নিরিখে এই মুহূর্তে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এককালের দক্ষ তদন্তকারী সংস্থা সিআইডির ডিআইজি পদে মধুবন্তী সেনকে এনে সরকার সিআইডির হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করতে চান—ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর এমনটাই ছিল মিডিয়ার ভাষ্য। চিরকাল লো-প্রোফাইলে থাকা মধুবন্তীকে এইসব মিডিয়া-টিডিয়া স্পর্শ করে না। নিজের কাজটা আরও দক্ষতার সঙ্গে পালন করাটাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

তবে এটা ঠিক, মধুবন্তী দায়িত্ব নেওয়ার পর সিআইডির কাজে যে গতি এসেছে, একবাক্যে স্বীকার করেন সবাই।

না, চোখ বুলিয়ে হবে না, সবিস্তারে পড়তে হবে রিপোর্টে। রিডিং গ্লাস বার করেন মধুবন্তী। পাশে রাখা ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ কফি নিয়ে পড়ায় মগ্ন হয়ে যান। পড়তে পড়তে দুশ্চিন্তার জাল ছড়িয়ে যায় মাথায়। এনআইএ বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির রিপোর্টগুলোই বেশি টেনশনের।

ইনস্পেকটর অনঙ্গ দেবকে কেসটার দায়িত্ব দেওয়া আছে কিন্তু এই কেসের জাল এতদূর বিস্তৃত, এই রিপোর্ট না পেলে বোঝাই যেত না।

ল্যাপটপে অনঙ্গের পাঠানো ফাইলটায় ক্লিক করেন। দ্রুত আবার পড়ে ফেলেন লাল রং-এ সিলেক্টেড অংশগুলো। সিতি নামের এক কমবয়েসি মেয়ে আর মাঝবয়সি এক মহিলা, অনামিকা সাহা, এখনও পর্যন্ত এই কেসের শিকার। সিতি বিষপ্রয়োগে ও অনামিকা 'ডেথ বাই স্ট্র্যাঙ্গুলেশন'।

এই অনামিকাই রক্তিম নাম নিয়ে র-এর গোয়েন্দা সেজে ফেসবুকে ফেক প্রোফাইল বানিয়েছিল। তারপর সিতির অ্যাপার্টমেন্টের ছোট্ট অর্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে হাসিল করেছিল কাজ।

চোখ বন্ধ করে তথ্যগুলোকে মাথায় সাজিয়ে নেন মধুবন্তী। সিক্স মাস্কেটিয়ার্সের একজন মৃত, জ্যোতিষী লকআপে। মেঘনা, মেরুন আর সিদ্ধেশ এই শহরেই আছে তবে বলা বাহুল্য কড়া নজরদারির মধ্যেই। সিতি ও অনামিকার মৃত্যুতে একটা ব্যাপার কমন—হেভি মেটাল। সিতির ক্ষেত্রে হেভি মেটাল পয়জনিং আর অনামিকার পায়ের গোড়ালিতে ইমপ্ল্যান্ট করা ছিল হেভি মেটাল পিনিয়ন।

কিন্তু চিন্তা একটাই, অনামিকা সাহার খুনি হিসেবে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল সেই চিন্ময়ী বেপাত্তা। এরা এত ক্যালাস! ফোন তোলেন মধুবন্তী।

ইন্টারকমে ডিআইজি ম্যাডামের ফোন পেয়ে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ান অনঙ্গ। জবরদস্ত ইনভেস্টিগেটর হিসেবে ভবানীভবনে তাঁরও যথেষ্ট নামডাক। কিন্তু ম্যাডাম আসার পর খেয়াল করেছে তাঁর আত্মবিশ্বাসও যেন মাঝে মাঝে টাল খেয়ে যায়। ম্যাডামের তদন্ত-পদ্ধতি তীক্ষ্ণ, যথাযথ। অসংখ্য তথ্য থেকে হাঁসের মতো শুধু দুধটুকু তুলে নিতে ওঁর জুড়ি নেই।

এমন হঠাৎ করে উনি তো ডাকেন না! চিন্ময়ী সরকার সিআইডির নজর এড়িয়ে কী করে পালাল—মনে হচ্ছে এই দিক থেকেই আক্রমণটা আসবে।

কপালে ঝাড় আছে ধরে নিয়ে ফোনটা রাখেন। কম কথা বলেন ম্যাডাম কিন্তু যেটুকু বলেন হুলের মতো বিঁধে যায়। কবজি উলটে ঘড়ি দেখেন। সোয়া চার। আবহাওয়া গুমোট। ক্যালেন্ডারে বর্ষাকাল। কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। সিডি আর একটা ফাইল নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন অনঙ্গ।

দিঘার অন্যতম সাইট সিয়িং তালসারি আর চন্দনেশ্বর। দুটোই ওড়িশার মধ্যে। জেলা বালেশ্বর। তালসারির নির্জন সি-বিচ আর চন্দনেশ্বরের শিব মন্দির পর্যটকদের আকর্ষণের জায়গা। চিন্ময়ী চন্দনেশ্বরের মোটর ভ্যানে ওঠে।

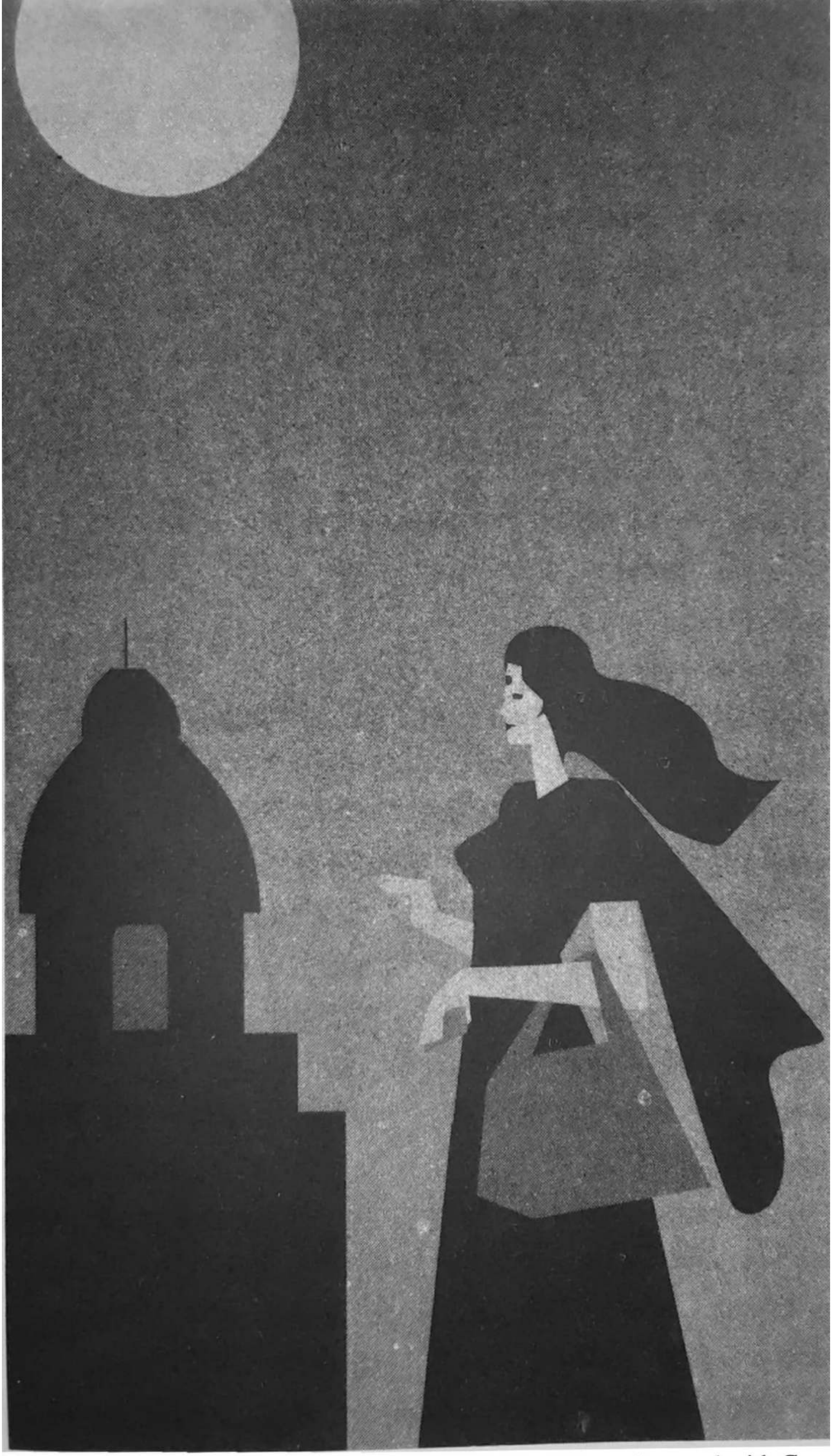
মাথায় আটকানো রোদচশমা নেমে আসে চোখে। গোল মুখের সঙ্গে মানানসই স্পোর্টস সানগ্লাস। ঘাড় অবধি নেমে আসা চুল আপাতত ছোট। বয়েজ কাট। শর্ট সাদা শার্টের সঙ্গে ব্লু জিন্‌স। পিঠে লেমন-কালো ইউনিসেক্স ব্যাক ব্যাগ। ভোদাই টিকটিকিগুলোর জন্য এটুকু ভোলবদল যথেষ্ট।

গন্তব্য চন্দনেশ্বরের শিবম লজ। ম্যানেজারের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে প্যাকেটটা। যদিও বিস্ফোরণ এলাকা থেকে চন্দনেশ্বর বেশ কিছুটা দূরে। ওখানে নিশ্চয়ই এখন চাপা উত্তেজনা। স্থানীয় লোকজন আশেপাশে ভিড় জমিয়ে জানতে চেষ্টা করবে আসলি নিউজ। খবরের কাগজে ছোট করে হলেও বেরিয়ে গেছে সেই খবর। এটা নিশ্চিত বলা যায়, এলাকার লোকের সামান্য কৌতূহল থাকলেও পর্যটকদের লেশমাত্র আগ্রহ থাকবে না এই খবরে। কিন্তু ভুবনেশ্বরের পুলিশ ব্যাপারটা ঘাঁটবে।

কাগজে কেএম ইন্টারন্যাশানালের নামটাও বেরিয়ে গেছে। এই অবস্থায় এখানে আসাটা যদিও সাংঘাতিক ঝুঁকির, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই, প্যাকেটটা নিতে আসতে হতই। ঝুঁকির কথা আবার মাথায় আসতেই মনে মনে হাসে চিন্ময়ী।

ঝুঁকি তো সেদিনই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল যেদিন কল্কির সদস্যপদ নিয়েছিল। কল্কিতে জয়েন না করলে জানতেই পারত না এই বিশ্বে অনেকেই তার মতো ভাবে। এত মানুষকে নিজের ভাবনার শরিক দেখে চিন্ময়ীর উদ্যম দ্বিগুণ হয়ে যায়।

ভটভট করে কালো ধোঁয়া ছেড়ে মোটরভ্যানটা যত নিকটবর্তী হয় চন্দনেশ্বরের, সামান্য হলেও চিন্ময়ীর অন্দরমহলে লাবডাব একটু বাড়ে কি? কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে কলকাতার ঘটনাগুলোর যোগসূত্র বের করা কি এতই সহজ? ফরেন্সিক আসবে এবং বিস্ফোরণের



কারণ হিসেবে আরডিএক্স-এর উপস্থিতি টের পাবে কিন্তু এর বেশি কিছু নয়।

একেবারে কিছু পাবে না তা নয়, পাবে কয়েকটা কম্পিউটার। আরও পরিষ্কার করে বললে কম্পিউটারের ফাঁকা খোল, কারণ প্রত্যেকটা হার্ডডিস্ক সরিয়ে ফেলা, হয়েছিল বিস্ফোরণের আগেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, উঠবে কেন নিশ্চয়ই এতক্ষণে উঠে গেছে, সমুদ্র সৈকতের পাশে এই বাড়িতে ঠিক কী হত?

'এই নিন, গো থ্রু—'

ঘরে ঢুকে বসতে না বসতেই মধুবন্তী একটা ফাইল ধরিয়ে দেন অনঙ্গকে। অনঙ্গ হুড়মুড়িয়ে শুরু করেন পড়তে। মধুবন্তী নিজের ফাইলে মগ্ন।

পড়তে পড়তে চোখ কপালে অনঙ্গর। তলে তলে এত! বেশ কিছু অজানা এবং বিস্ফোরক তথ্য পাঠিয়েছে এনআইএ দিল্লি থেকে। রিপোর্টে বলছে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী ওড়িশার তালসারি সি-বিচ এলাকায় যে গবেষণাগারে বিস্ফোরণ ঘটেছে সেখানে তৈরি হচ্ছিল এক মহাষড়যন্ত্র। এর পেছনে কাজ করছে কল্কির মাথা।

কল্কি আবার কী রে বাবা! অনঙ্গ চোখ গোল গোল করে পড়েই চলেন। কল্কি একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এমন নামের কোনও সংগঠনের নাম অনঙ্গ কখনও শোনেননি! এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা। আর এই সন্ত্রাস নির্মূল করতে তাদের হাতিয়ারও সন্ত্রাস। তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলায় বিশ্বাসী।

'যে কেউ, যে-কোনও দেশের, যে-কোনও ধর্মের, যে-কোনো বয়সের নারী-পুরুষ এই দলের সদস্য হতে পারেন। তবে তাদের সন্ত্রাসবাদী হওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া চাই বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসের অবসান—কিছু বুঝলেন?'

ম্যাডামের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন অনঙ্গ। মধুবন্তী রিডিং

গ্লাসটা নামিয়ে আবার শুরু করেন, 'আমাদের দেশের পুরাণের গল্পে আছে, কল্কি অবতার কলিযুগে এই ধরাধামে এসে ঘোর কলির অবসান ঘটিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই গল্প থেকেই এরা নামটা কল্কি নিয়েছে।'

'এরা কি ধর্মীয় সংগঠন?'

'না, না, ধর্ম-টর্মের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। যে-কোনো সন্ত্রাসের এরা বিরোধী। সে ধর্মীয় সন্ত্রাস হতে পারে—রাজনৈতিক সন্ত্রাস হতে পারে। সাধারণ মানুষকে এরা তাদের সদস্য হতে আহ্বান করে। এদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ, মূলত কম বয়েসিরা এদের সদস্য হয়েছেন। ভারতেও এরা খুলে ফেলেছে দলের শাখা। চিন্ময়ী সরকার এই কল্কির ভারতীয় শাখার সদস্য। সক্রিয় সদস্য।'

'আর ওর বন্ধুরা? জ্যোতিষী?' বিস্মিত অনঙ্গ প্রশ্ন করেন।

'সম্ভবত ওরা কেউ মেম্বার নয়।'

'সিতি? অনামিকা সাহা? ওরা কারা?'

'দুজনেই টেররিস্ট দলের ইনফর্মারের কাজ করত—এক নয় একাধিক গ্রুপের।'

'একাধিক?'

'ইয়েস—এখন এটা খুব লুক্রেটিভ পেশা—প্রচুর পয়সা পাওয়া যায়—সামান্য কিছু ইনফর্মেশন এধার-ওধার করতে পারলেই দেদার কামাই—বেহিসেবি সিতি অর্থাভাবে এই কাজে জড়িয়ে পড়েছিল।'

'তাহলে চিন্নি মানে চিন্ময়ী দুজনকেই মার্ডার করল?'

'অনামিকাকে কাজে লাগিয়ে সিতিকে খুন করল'—

'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলল—' অনঙ্গের বিস্ময় কমে না।

'ইয়েস—সিতি ওর পরিচিত, বন্ধুস্থানীয়। নিজে ওই দায়িত্ব নেয়নি। কিন্তু অনামিকার ক্ষেত্রে কারও ওপর নির্ভর করেনি। কারণ অনামিকা অনেক অভিজ্ঞ—বিপজ্জনকও বটে—তাই নিজেই শেষ করল অনামিকাকে।'

'কী বলছেন ম্যাডাম—চিন্নিই তাহলে মেইন কালপ্রিট!'

'এনআইএ-এর রিপোর্ট তাই বলছে—আর এনআইএ এই মুহূর্তে আমাদের দেশে কাউন্টার-টেররিজম নিয়ে তদন্তের ক্ষেত্রে সবথেকে অগ্রণী অর্গানাইজেশন—২৬/১১-তে আজমল কাসভদের মুম্বই অ্যাটাকের পর আমাদের দেশে একেবারে আইন বানিয়ে এনআইএ তৈরি হয়—সুতরাং—'

'না, মানে, ম্যাডাম—'

'ইন্টারন্যাশানাল স্ট্যান্ডার্ড ওদের—তাই ওদের কথা অবিশ্বাসের কারণ নেই—আপনি কি বিশ্বাস করছেন না অনঙ্গ?'

'না ম্যাডাম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নয়—আমি ভাবছি—'

'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন—আর যা ভাবছেন, ঠিকই ভাবছেন—চিন্ময়ীকে যতটা চুপচাপ বোকাসোকা ভেবেছিলেন আদৌ ও তা নয়—আর ওকে নাগালের বাইরে পাঠিয়ে আপনারা সাংঘাতিক অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন—।'

অনঙ্গ মাথা নীচু করেন। শুরু হয়ে গেছে গোলাগুলি ছোঁড়া। কিছু করার নেই, সহ্য করতে হবে। কিন্তু সত্যি অবাক হতে হয় চিন্নির কথা শুনে। সিতির বন্ধুদের মধ্যে সবথেকে নিরীহ আর গোবেচারা মনে হয়েছিল ওই মেয়েটিকে।

ছোট্টখাট্ট চেহারার, চোখেমুখে ষড়যন্ত্র বা সন্ত্রাসের তিল মাত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি, অনঙ্গ নিজে জেরা করেছিলেন মেয়েটিকে। কিছুই বোঝেননি। ভাবলে অবাক হতে হয় কী নিপুণ দক্ষতায় সব বন্ধুদের কাজে লাগিয়েছিল।

'চিন্ময়ী সরকার এই মুহূর্তে মেইন সাসপেক্ট অ্যান্ড মোস্ট ওয়ান্টেড অ্যাজ ওয়েল—কিন্তু—'

থামলেন মধুবন্তী। হাঁ করে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে অনঙ্গ। 'কিন্তু' বলে থামলেন কেন ম্যাডাম? আর কী কী রহস্য লুকিয়ে আছে এর পেছনে? আরও অন্য কেউ কি আছে চিন্ময়ীর সঙ্গে?

'চিন্ময়ী তো একা নয়—এই শহরে কল্কির আরও মেম্বার আছে—ওদের নেটওয়ার্ক দুর্দান্ত—চিন্ময়ীকে সাহায্য করছে অনেকেই—তাদের সকলের খোঁজ চাই—'

'কিন্তু ম্যাডাম তালসারির ল্যাবে একসপ্লোসন কেন হল? কী সম্পর্ক এই কেসের সঙ্গে?'

'এটাই তো ষড়যন্ত্র—'

'ষড়যন্ত্র!'

'যদিও এটাকে আসল ষড়যন্ত্র ভেবে বসলে ভুল হবে—' যাঃ কলা! ষড়যন্ত্র অথচ ষড়যন্ত্র নয়, ম্যাডাম যে কী হেঁয়ালি করছেন বোঝা দায়। কিন্তু মুখে কিছু বলেন না অনঙ্গ।

'রেড হেরিং বোঝেন?'

'রেড হেরিং!'

'ফল্‌স ইস্যু তৈরি করে মাইন্ড অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা—এনআইএ-এর সন্দেহ তালসারির বিস্ফোরণ আসলে একটা রেড হেরিং—আই ওয়াশ—'

'কিন্তু কেন ম্যাডাম?'

'ওদের ধারণা কল্কি খুব বড় কিছু একটা ঘটাতে চলেছে—'

'বড় কিছু? কবে? কোথায়?'

'সেটা জানা যায় না—কিন্তু এনআইএ-এর ঘোরতর সন্দেহ—আমাদের এই ব্যাপারেই সাবধান করেছে—'

'আমাদের যখন সাবধান করছে, তার মানে ম্যাডাম, আমাদের বাংলাতেই কোনও আক্রমণ নেমে আসতে চলেছে?'

ম্যাডাম নিঃশব্দে ইতিবাচক মাথা নাড়েন। অনঙ্গের লাবডাবানি কিঞ্চিত বেড়ে যায়। সিআইডির হাতে কেস আর সেই কেস-এর পূর্বাভাস বলছে তীব্র সাইক্লোন আছড়ে পড়তে চলেছে বাংলার বুকে! সেই ঝড়ে ইনস্পেকটর অনঙ্গ দেবের আসন টিকে থাকবে তো।

'কল্কি এমন কী ঘটাতে পারে ম্যাডাম?'

উত্তেজনায় প্রশ্নটা করেই অনঙ্গ বোঝেন বালখিল্য প্রশ্ন হয়েছে। ম্যাডামকে এইসব লোপ্পা ফুলটস দিলে মেরে গ্যালারি পার করে দেন। কিন্তু না, আজ ছক্কার দিকে গেলেন না ম্যাডাম। ঠান্ডা মাথাতেই উত্তর দিলেন। তার মানে ম্যাডামও বেশ চিন্তিত আর

ম্যাডাম চিন্তিত মানে কেস ক্রমাগত জটিল।

'এনিথিং ক্যান হ্যাপেন—সমস্ত প্রিকশান্‌স নিতে হবে আমাদের—সেক্রেটারিয়েট থেকেও সেইরকমই ডিরেকশন গেছে সমস্ত সরকারি সিকিউরিটি এজেন্সির কাছে—সো অনঙ্গ, বি সিরিয়াস—'

'মিসগাইড করতে চাইছে কেন ওরা?'

'আমরা চাঁদিপুর চাঁদিপুর বলে লাফালাফি করছিলাম—কিন্তু দেখা গেল চাঁদিপুর নয়, জায়গাটা তালসারি—যদিও ধ্বংসস্তূপে সেইরকম কিছুই পাওয়া যায়নি—ওখানে ঠিক কী হত সেটাও স্পষ্ট নয়—ওড়িশা পুলিশ আর এনআইএ বলছে কল্কির একটা ঠেক ছিল তালসারিতে এটা নিশ্চিত—কাজ গুটিয়ে নিয়ে সম্ভবত নিজেরাই ল্যাবটা উড়িয়ে দিয়ে গেছে—'

'এই কেসে হেভি মেটাল পিনিয়ন থাকায় আমরা প্রাইমারিলি ভাবছিলাম কোনও কোড ইমবেডেড যদি থাকে—যেহেতু কাছেই চাঁদিপুর আই টি আর—কিন্তু ওই পিনিয়ন থেকে এখনও পর্যন্ত কিছুই তো উদ্ধার করা গেল না ম্যাডাম—'

পকেটে সেল ফোনটা কেঁপে ওঠে অনঙ্গের। ম্যাডাম কথা বলছেন, ফোন ধরাটা ঠিক হবে না ভেবে অনঙ্গ ফোনটাকে রিসিভ করেন না। সেলটা কেঁপে কেঁপে বন্ধ হয়ে কিন্তু পরক্ষণেই আবার কম্পন। তার মানে জরুরি কল। ম্যাডামের থেকে অনুমতি নিয়ে ফোনটা ধরেন অনঙ্গ। বিকাশ কলিং।

'হ্যাঁ, এনি নিউজ?'

'স্যার, চিন্ময়ী গড়িয়াহাটের একটা বিউটি পার্লার থেকে হেয়ার স্পা করিয়েছে—চুলের ছাঁটটাও বদলেছে—অনেক ছোট করেছে ছবিটাও পেয়েছি স্যার-'

'তারপর?'

'বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরেছে—তারপর আর খবর নেই—তবে ট্যাক্সির নাম্বারটা পেয়েছি—ড্রাইভারের থেকে ডেস্টিনেশন পেয়ে যাব—কল ইউ উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার স্যার—'

'ও.কে. বিকাশ—গো অ্যাহেড!'

ফোনটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রাখতে অনঙ্গ ম্যাডামকে সবটা জানান। কিন্তু মধুবন্তী কিছুই বলেন না। যেন বিশেষ কোনও চিন্তায় মগ্ন। অনঙ্গও ম্যাডামের মুখ খোলার অপেক্ষায়। শেষমেষ মধুবন্তী মুখ খোলেন।

'মেরুন, সিদ্ধেশ আর মেঘনা—তিনটেকে ছেড়ে রাখুন আন্ডার ডাবল সারভেইলান্স—ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের খবর চাই আমার—চ্যাটিং-মেলিং-স-ব-সাইবার ক্রাইম সেলকে বলুন দরকার হলে গুগল ফেসবুক অথরিটির সঙ্গে কথা বলতে—দেশের সিকিউরিটির জন্য প্রাইভেট সিকিউরিটি ব্রেক করা যায়—আজ থেকে আগামী কয়েকদিন খুব ক্রুশিয়াল—'

'ও.কে. ম্যাডাম!'

'আর একটা কথা অনঙ্গ, চিন্ময়ী যেখানেই যাক—আই গেজ, আগামী কয়েকদিন ও কলকাতায় থাকবে—'

ম্যাডামের কথায় মনে মনে বেশ চমকায় অনঙ্গ। কলকাতা? তার মানে আক্রমণের লক্ষ্য কি এই মহানগর? চিন্ময়ী কলকাতাতেই থাকবে, এই অনুমান কেন তবে? কিন্তু একটা প্রশ্ন খচখচ করছে অনেকক্ষণ থেকে। শেষমেষ প্রশ্নটা করেই ফেলেন অনঙ্গ।

'কল্কি যদি টেররিজমের এগেন্সটে হয় ম্যাডাম, তা হলে তো পুলিশেরই ভালো?'

'খেয়াল করবেন আমি বলেছি ওরা যে-কোনও টেররিজমের এগেন্সটে। সন্ত্রাস তো একা সন্ত্রাসবাদীরাই চালায় না, রাষ্ট্রও সন্ত্রাস ছড়ায়। আমি, আপনি—আমরাই সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাতিয়ার। পুলিশ, মিলিটারি, চেকিং, ব্যারিকেড, ধরপাকড়। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, উচ্ছেদ করা—রাষ্ট্রের এই ভয়ংকর মুখ তো আমাদের অচেনা নয়। স্টেট টেররেরও ওরা বিরোধি—কাশ্মীর আর নর্থ-ইস্টে ওদের সদস্য সংখ্যা তাই বেশ ভালো অ্যান্ড দে আর গ্রোয়িং গ্র্যাজুয়ালি—সো ডোন্ট টেক দেম লাইটলি।'

'কিন্তু ম্যাডাম—' অনঙ্গ কথা শেষ করতে পারেন না। ফোনটা আবার কেঁপে ওঠে। আবার বিকাশ। অনঙ্গ ধরেন।

'স্যার আজ দুপুর সাড়ে ১২ নাগাদ ট্যাক্সিটা চিন্ময়ীকে কোলাঘাটে ছেড়েছে—'

'কোলাঘাট!'

'ইয়েস স্যার!'

বিকাশের ফোনটা ছেড়ে ম্যাডামকে খবরটা দেন অনঙ্গ। কোলাঘাট শুনেই মধুবন্তী নিজের সেল থেকে পরপর দুটো কল করেন। পূর্ব মেদিনীপুর আর ওড়িশার বালেশ্বর জেলার এসপি।

চিন্নির গন্তব্য তালসারি—মধুবন্তী নিশ্চিত। ইন্সপেক্টর অনঙ্গ দেবও।

আনুষ্ঠানিকভাবেই খুব দ্রুত ভবানীভবন থেকে বার্তা যায় দুই প্রতিবেশী জেলা আইবি দফতরে। তালসারি পড়ে চন্দনেশ্বর থানার আওতায়। অনঙ্গ ফোন করেন ওড়িশার চন্দনেশ্বর থানায়। রামনগর আর দিঘা কোস্টাল থানাতেও জানিয়ে দেওয়া হয়।

শিবম লজের ম্যানেজারের সঙ্গে কোড বিনিময় করে চিন্ময়ী। টেবিলে ব্যাগটা রেখে শুরু করে কথা। হেসে হেসে কথা বলতে বলতে নিপুণ কায়দায় সিসি টিভিকে আড়াল করে ম্যানেজার টেবিলে রাখা চিন্নির ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন প্যাকেটটা। ছোট প্যাকেট। আর অপেক্ষা করার মানে নেই। যেটার জন্য এখানে আসা সেটাই যখন হস্তগত তখন আর এখানে থেকে ঝুঁকি বাড়িয়ে লাভ নেই।

উঠে পড়ে চিন্ময়ী। কিন্তু লজের বাইরে যায় না। ঢুকে পড়ে ভেতরে। দোতলার একটা এসি ঘর খুলে দেয় লজের বয়। রুম নাম্বার নাইন। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে চিন্নি।

ওদিকে রামনগর আর দিঘা কোস্টাল পিএস থেকে বাছাই করা পুলিশ ভর্তি দুটো সুমো দ্রুত গতিতে এগোয় তালসারির দিকে। দিঘার সমস্ত হোটেল, গেস্ট হাউস, লজ ইত্যাদিতে তল্লাসি শুরু করে সাদা পোশাকের পুলিশ। চন্দনেশ্বর থানাও এলাকার বিভিন্ন হোটেল ও লজ-এ পুলিশ পাঠায়।

শিবম লজের দোতলার নয় নম্বর এসিটা ১৮ ডিগ্রিতে চালিয়ে

বিছানায় রাখা ব্যাগটা খোলে চিন্ময়ী। আজ রাতের মধ্যেই ঢুকতে হবে কলকাতা। এখান থেকে কীভাবে বেরোবে ছকা আছে সবটা। নিখুঁত পরিকল্পনা ছাড়া কল্কি কোনও কাজ করে না। ব্যাগ থেকে বার করে লোটাস পিঙ্ক একটা চান্দেরি সিল্ক শাড়ি। গায়ের ওপর শাড়িটা মেলে নিজেকে দেখে আয়নায়। হাসে।

ভবানীভবনে নিজের চেম্বার থেকে নড়েন না মধুবন্তী। টেলিফোনে আসা একটা হাড়হিম তথ্য ঘেঁটে দিয়েছে তাঁকে। এমন একটা খবরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কলকাতা আক্রান্ত হতে পারে এমন একটা নিউজ ছিলই। এনআইএ সাবধান করেছিল। তাই বলে এতটা!

খবরটা দিলেন স্বয়ং হোম সেক্রেটারি। দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এই জরুরি রিপোর্ট এসেছে কিছুক্ষণ আগে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন নাকি মহানগরে নেমে আসতে চলেছে এক ভয়াবহ আক্রমণ।

শহরের শপিং মল আর মাল্টিপ্লেক্সগুলো নাকি কল্কির টার্গেট। তারা নাকি একসঙ্গে দশটি জায়গায় বেনজির সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাতে পারে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের পালটা সন্ত্রাস। সেজন্য বেছে নিয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজোড়া ভালোবাসার দিনটিকে।

শহরের সমস্ত সিকিউরিটি এজেন্সিকে দিয়ে কলকাতার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে হবে—এমনই নির্দেশ সেক্রেটারিয়েটের। আজ রাত আটটায় উচ্চপর্যায়ের এক মিটিং ডাকা হয়েছে লালবাজারে।

কলকাতা ও সল্টলেকের সমস্ত শপিং মল আর মাল্টিপ্লেক্সের তালিকায় আবার চোখ বোলান মধুবন্তী।

কেবল শপিং মল আর মাল্টিপ্লেক্স কেন? কল্কি যে-কোনও জায়গাতেই তো হামলা চালাতে পারে! স্টেট টেররিজমেরও যেহেতু তারা বিরোধী তাই হামলার শিকার হতে পারে আমেরিকান সেন্টার, ফোর্ট উইলিয়াম, মহাকরণ, নবান্ন, লালবাজার। ভবানীভবনও হতে পারে। হতে পারে কলকাতা মেট্রোও।

ঘরে ঢোকেন অনঙ্গ। তাঁকে আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন মধুবন্তী। রাত আটটায় মিটিং-এর জন্য যাবতীয় ইনফর্মেশন ফিঙ্গার টিপ্‌সে চাই। কী-কী তাঁর চাই বিশদে অনঙ্গকে বুঝিয়ে দেন। অনঙ্গ লং হ্যান্ডেই টুকে নেন পুরোটা।

'ও.কে.—কিছু বাদ পড়ল অনঙ্গ?'

'না ম্যাডাম, একটা কথা বলব ম্যাডাম?'

'বলুন—'

'বহু মানুষকে মেরে বা সম্পত্তি ধ্বংস করে কল্কি তো সেই টেররিজমই প্র্যাকটিস করছে!'

'ওদের ভাষায় এসব কো-ল্যাটেরাল ড্যামেজ—আগামী বিশ্বে শান্তি আনতে হলে আপাতত এই ক্ষতিটুকু স্বীকার করতে হবে—'

'এ তো ভয়ানক চিন্তাভাবনা ম্যাডাম!'

'বুঝেছেন যখন বি সিরিয়াস টু দ্য আটমোস্ট—কোনও ইনফ্যান্টাল ডিসঅর্ডার আমি বরদাস্ত করব না—চিন্ময়ীর লেটেস্ট নিউজ কিছু আছে?'

'না ম্যাডাম—তবে কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু রিপোর্ট আশা করছি।'

'এখন সময় নষ্ট না করে রিপোর্টটা রেডি করুন-সফট অ্যান্ড হার্ড, দুটোই চাই-।'

সন্ধে ছ'টা। শ্রাবণ মাসের ভুবন এখনও আলোয় ভরা। চন্দনেশ্বর থানা থেকে পুলিশ পৌঁছে যায় শিবম লজেও। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। চিন্ময়ী সাম্প্রতিকতম ছবি দেখায়। ম্যানেজার ছবিটা দেখেই চমকান। এমন চেহারায় একটি মেয়ে তো তাঁদের লজেই আছেন। বিকেলের দিকেই ঘর নিয়েছেন। দোতলায় রুম নাম্বার নাইন।

পুলিশ যখন শিবম লজের নয় নম্বর ভেজানো দরজা ঠেলে ঢোকে, পরনে গোলাপি চান্দেরি, কপালে সিঁদুর, এক ঢাল চুলের এক বধূ চন্দনেশ্বর শিব মন্দিরের সন্ধ্যারতি দেখে হাসিমখে।

মন্দির চত্বরে আকুল ভক্তবৃন্দের মাঝে নিজেকে এই বেশে আবিষ্কার করে মনে মনে হাস্যমুখর চিন্ময়ী। শাড়ি আর দামি উইগটা পরতেই চূড়ান্ত ভোলবদল। নিজেই যেন নিজেকে চিনতে পারে না। তারপর পিঠের ব্যাগ থেকে ফোল্ডিং একটা নেভি ব্লু ট্র্যাভেল ব্যাগ বার করে সব ঢুকিয়ে ফেলে, এমনকী পিঠের ব্যাগটা পর্যন্ত।

মেকআপটা নিতেই একটু যা সময় লাগল। রুমালের বেড়ালরূপ দেখে ম্যানেজারও হাঁ। তবে লোকটার হেল্প ভোলার নয়। এসব কাঠবেড়ালি নিয়েই তো একদিন কল্কি আড়ে-বহরে স্ফিত হবে। নির্মূল হবে সন্ত্রাস। লজ থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে সোজা শিবমন্দির।

আরতির আলো আর ঘণ্টাধ্বনির অপার্থিব আনন্দলহরীকে পেছনে ফেলে মন্দির থেকে বেরোয় চিন্ময়ী। আবার একটা মোটরভ্যানে ওঠে।

কেবল মন্দির থেকে বেরোবার আগে, নতুন মোবাইল সেটে নতুন সিম ঢুকিয়ে লিখল একটা টেক্সট মেসেজ। তারপর সেন্ড অপশনে আঙুলের আলতো টোকা। টেক্সটে লেখা—১৪ নিশানা বদল। পুলিশ জানবে M, বাট দ্য N উইল বি শিভারিং...ডিটেইলস পেয়ে যাবে যথা সময়ে। টেক কেয়ার...।

১০

১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে।

ডিআইজি সিআইডি, সিনিয়ার আইপিএস মধুবন্তী সেন তারিখটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। এদিন কলকাতায় কিছু একটা ঘটাবে? কী ঘটাবে? কোনও বিস্ফোরণ, অথবা ২৬/১১-র মতো সামনাসামনি কোনও হামলা? না কি অন্য কিছু? এমনই

কি ঘটাতে চাইছে কল্কি। টেররিজমের এগেন্সটে যারা টেররিজমের পথেই চলেছে, সেই কল্কির সদস্যদের পাঠানো বার্তা থেকেই এমন তথ্য মিলেছে।

দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে যে খবরটা এসেছে সেটাকে সামনে রেখেই আপাতত মধুবন্তী সেন তার কাজ ঠিক করছিল। এই পর্বে এতদিন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে—চিন্ময়ী, চিন্ময়ী সরকার, চিন্নিই আপাতত এখানকার টপ পজিশনের মেম্বার। সেখান থেকেই গেমটা অপারেট করছে।

মধুমন্তী এ-ও জানে, চিন্নির ওপরেও অনেক বড় বড় মাথা আছে। কিন্তু আপাতত ওকে টার্গেট করেই এগোতে হবে। হদিশ করতে হবে ওদের জাল কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতদূর বিস্তৃত? বা আরও কারা কারা জেনে বা না-জেনে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে? অনেক প্রশ্নের উত্তর চিন্ময়ী জানে। চিন্ময়ীকে ধরতে পারলে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে।

মেয়েটিকে মধুবন্তী দ্যাখেনি। সিতি খুনের কেসে অনঙ্গ ওকে ইন্টারোগেট করেছিল। পুরোপুরি ধোঁকা খেয়েছে। তারপর মেট্রো স্টেশনেও ট্রেন বদলে মেয়েটা ওদের ফাঁকি দিয়েছে। তখনও অনঙ্গরা অতটা ভাবেনি, ভাবেনি মেয়েটা ওদের নিয়ে এতটা খেলা খেলতে পারে! তারপরে, ওরা যদি একটু সতর্ক থাকত তবে সিদ্ধেশের ঠাকুদার বাড়িতে মেয়েটা এসেছিল। সিদ্ধেশ মেঘনা মেরুনের সঙ্গে মিটিং করেছিল। মেয়েটার ভোলাভালা সহজ সরলভাবই ওর মুখোশ।

অনঙ্গ দেব চিন্ময়ীর ফোনের কল লিস্ট অ্যানালিসিস করতে দিয়েছিল। রিপোর্টটা পেয়েছে পরশু। বেশিরভাগ ফোনই বন্ধুবান্ধবদের। সিতি, মেরুন, প্রলয়েশের মতো বন্ধুদের। কিন্তু সেই লিস্টে একটা নম্বর ভারী অদ্ভুত! সেখানে ফোন হয়েছে প্রতি রবিবার, ঠিক সকাল এগারোটায়। গত তিন মাস ধরেই চলছে। একটা ল্যান্ড লাইন নম্বরে ফোনটা করা হয়।

প্রতি ক্ষেত্রেই তিন-চার মিনিট করে কথা হয়েছে। সপ্তাহের অন্য কোনও দিন ওই নম্বরে আর ফোন হয়নি, বা কোনও ফোনও আসেনি। যা হয়েছে তা শুধুমাত্র রবিবার—সকাল এগারোটায়।

পরশুই ওই নম্বরে অনঙ্গ একটা ফল্স ফোন করেছিল। বলেছিল—টেলিফোন কোম্পানি থেকে ফোন করছে, ওই ল্যান্ড লাইন যার, তাকে একটি গিফ্ট দেওয়া হবে। একটা হাত ঘড়ি। দেবে টেলিফোন কোম্পানি।

শুনে লোকটা খুব খুশি হয়েছিল। নাম-ঠিকানা নিয়ে আজ ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছে বিকাশ। একটা ঘড়ি কিনতে হয়েছে কাল। সেটাও সঙ্গে আছে। এ ছাড়াও কিছু কাগজপত্র যেগুলো গিফ্টের প্রমাণ স্বরূপ পৌঁছে যাবে সকাল দশটার মধ্যে। এক ঘণ্টা এইসব গিফ্টের কাগজপত্র সইসাবুদ করতে কেটে যাবে। এগারোটায় আজও নিশ্চয় চিন্নি ফোন করবে। ওই নম্বরটাই মধুবন্তীর চাই। এই ফোন নম্বরের লোকেশন ট্রেস করতে পারলেই চিন্নির খেল খতম।

মধুবন্তী, অনঙ্গ আজ সবাই কন্ট্রোল রুমে।

বিকাশ ঠান্ডা মাথার ছেলে। আশা করা যায় ও কাজটা গুছিয়েই করে আসতে পারবে।

বিকাশ যখন রসুলপুরে পৌঁছোল তখন সকাল ন'টা পঞ্চাশ। রসুলপুরে ঢোকার মুখেই সে গাড়ির সামনে ও পিছনে বিএসএনএল-এর কাগজ সেঁটে দিল। কোনও রকম বুঝতে দেওয়া চলবে না সে কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে। রবিবার সকাল এগারোটার ফোন কলটা খুবই মহার্ঘ্য। চোদ্দো তারিখের আগে দুটো রবিবার পাওয়া যাচ্ছে। একটা মিস করলে, পরের রবিবারটা হাতে থাকবে। খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে ওদের।

রসুলপুরে গিয়ে নিবারণ সাঁতরার নাম বলতেই তাকে আরও ভেতর দিকে এগিয়ে যেতে বলা হল। বিকাশ বুঝল রসুলপুরের গঞ্জবাজার এলাকায় নিবারণের ফোনটা নেই। আছে আরও ভেতরে কোথাও। বেশ কিছুটা এগোতে পাওয়া গেল নিবারণের বাড়ি। ছোট একটা পাকা বাড়ি, সামনে মুদিখানা দোকান। ফোনটা দোকানেই

আছে। বিকাশের জন্য চেয়ার টেবিল সব ঘরের ভেতর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নিবারণ মানুষটাকে দেখে বিকাশ বুঝল নিপাট ভালোমানুষ। কলকাতা থেকে গিফ্‌ট আসছে বলে সে সকাল বেলাতেই স্নানটান সেরে, সেজেগুজে বসে আছে। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে বিকাশ বলল, আমাকে অফিসে একটা ফোন করতে হবে, আপনার নম্বর থেকে কল করে, বড়বাবুকে জানিয়ে আপনার হাতে ঘড়িটা পরিয়ে দেব।

ঘর ছেড়ে ওরা এবার দোকানের ভেতর এসে বসল। বিকাশ কন্ট্রোলরুমে ফোন করল। অনঙ্গ জানিয়ে দিল, সব ঠিক আছে। মানে মধুবন্তী সেন পুরো টিম নিয়ে অপেক্ষা করছে।

গিফ্‌ট উপলক্ষ্যে দোকানের বাইরে ছোটখাটো একটা ভিড়।

আজও নিশ্চয় চিন্ময়ী এগারোটায় ফোন করবে...। কিন্তু কাকে ফোন করবে?

বিকাশ বলল, নিবারণবাবু আসুন, আপনার হাতে ঘড়িটা পরিয়ে দিই।

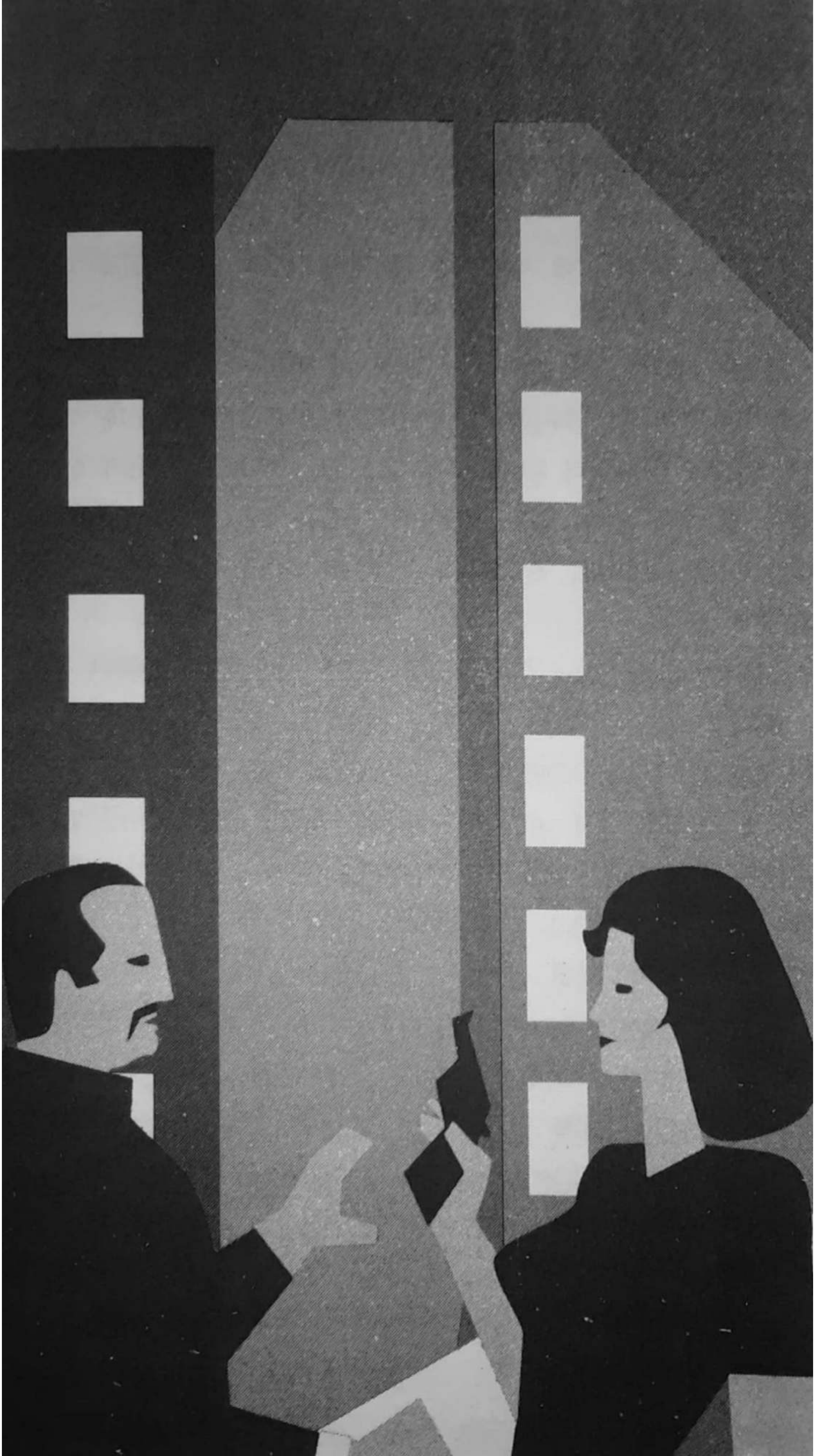
ঘড়ি পরানোর পর মিষ্টিমুখ, সে পর্বও শেষ হল। বিকাশ দেখল, ঘড়িতে ঠিক দশটা চল্লিশ। বলল, নিবারণবাবু আপনি দোকানদারি করুন, আমি বসে বসে অফিসের কাগজপত্র তৈরি করি। আরও দুজনকে গিফ্‌ট পৌঁছে দিতে হবে। এমন সময় ক্রাচে ভর দিয়ে একজন মানুষ দোকানের ভেতর ঢোকে। তাকে দেখেই নিবারণ বলে ওঠে—'অ্যাই মৈনুদ্দিন আজ ফোন হবে না। আজ ফোন বন্ধ।'

কথাটা শুনেই মৈনুদ্দিন পাশে রাখা বেঞ্চে ধপাস করে বসে পড়ে। তার একটা ক্রাচ মাটিতে পড়ে যায়।

বিকাশ বলে ওঠে, 'উনি কে? কাকে ফোন করবেন?'

'মৈনুদ্দিন ফোন করে না, ওর ফোন আসে।'

বিকাশ হঠাৎ পুলিশি হুমকি দেওয়া গলায় বলে ওঠে, না, না, ওকে ফোন করতে দিন। ওর ফোন আসুক।' কোনও বাধা নেই' কথাটা বলেই বিকাশ বুঝতে পারল সুরটা একটু বেশি চড়া হয়ে



গেছে। বিকাশ আবার বলে, 'আপনি এমন প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে ফোনের পরিষেবা দিচ্ছেন বলেই তো পুরস্কার পাচ্ছেন। ফোন বন্ধ করলে আর পুরস্কার পাবেন না। এর পরের পুরস্কার টিভি। নিন, ওকে আসতে বলুন। ওর ফোন আসবে তো—উনি ফোন রিসিভ করুক।'

নিবারণ বলল, 'ও ওখানেই বসুক—ফোন এলে ওকে এগিয়ে দেব।'

বিকাশ বলল, 'কী হয়েছিল—উনি পা দুটো কীভাবে খোয়ালেন?'

নিবারণ বলল, 'মৈনুদ্দিন খুব ভালো মানুষ। আমাদেরই গাঁয়ের। কাজ করতে গিয়েছিল মুম্বাই। মুম্বাইতে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল তাতে ও খুব জখম হয়। ওর পা দুটো বাদ যায়। দেশে ফিরে আসে বেচারা। এখন ও একটা সাইকেল সারানোর দোকানে কাজ করে।'

বিকাশ একদৃষ্টিতে মৈনুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। মুম্বাই বিস্ফোরণে এই মানুষটার পা উড়ে গেছে...। ওর কাছে ফোন আসে প্রতি রবিবার সকাল এগারোটায়। যে ফোন করে সে কল্কির মেম্বার। কল্কি...। টেররিজমের এগেন্সটে কল্কির লড়াই। আর এই মানুষটা টেররিজমের শিকার। দুটো পা হারিয়েছে। হিসেব যেন মিলে যাচ্ছে। তবে কি এ-ও কল্কির মেম্বার?

বিকাশ বলল, 'কে ফোন করে ওকে?'

'ওর সঙ্গে মুম্বাইতে একটা মেয়ের আলাপ হয়। সে-ই টাকাপয়সা দিয়ে ওকে দেশে ফিরিয়ে আনে। খুব ভালো মেয়ে। আমাদের গাঁয়েও এসেছে। সে-ই ফোন করে। মাঝে মাঝে মৈনুদ্দিনকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্যে করত। এখন মৈনুদ্দিন সাইকেল সারানোর কাজ করার পর আর সাহায্য নেয় না। কিন্তু মেয়েটা প্রতি রবিবার ওকে ফোন করে। ও আমার দোকানে এসে অপেক্ষা করে।

'কী নাম মেয়েটার?'

'চন্দ্রা।'

অনঙ্গ হাসল, চিন্ময়ী, চিন্নি, চন্দ্রা...সব চ-য়ের যোগ।'

ফোন বাজল। পিঠ সোজা করে বসল বিকাশ। ঘড়িতে ঠিক এগারোটা।

নিবারণ ক্রেডেল সুদ্ধ ফোনটা এগিয়ে দিল মৈনুদ্দিনের কাছে। বিকাশ বলল, 'মৈনুদ্দিনভাই ভালো করে কথা বলুন, একদম তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আপনি যত কথা বলবেন, আমাদের নিবারণবাবু তত বোনাস পয়েন্ট পাবেন, যত বোনাস পয়েন্ট তত দামি পুরস্কার। ফোন এলে নিবারণবাবুর তো কোনও খরচ নেই, ওর সবটাই লাভ।

মৈনুদ্দিন ফোন হাতে নিয়ে রিসিভার তুলল।

'হ্যালো...।'

রবিবার সকাল বেলা এদিকটা গাড়িতে-মানুষে জড়িয়ে মড়িয়ে যায়। ট্যাক্সিটা একদম গেটের সামনে এনে দাঁড় করাল চিন্ময়ী। এই বাড়িটা সে চেনে। ও যেখানে দাঁড়াল সেটা একটা তিনতলা বাড়ি। আপাতত প্যাকিং বাক্স তৈরির কারখানা। কিন্তু এখানে কোনও কালেই প্যাকিং বাক্স তৈরি হয়নি।

এখন সকাল দশটা। বেশ কয়েকটা ফাইল নিয়ে চিন্ময়ী এসে দাঁড়াল বাড়িটার গেটে। আজ বাড়িটার গেটে কোনও সিকিউরিটি গার্ড নেই। আছে স্বয়ং রামশংকর; মুহূর্তে সাদর আমন্ত্রণে তাকে নিয়ে যাওয়া হল বাড়ির ভেতরে। বাড়িটা রামশংকরের।

রামশংকর রাজারহাট নিউ টাউনের এক মস্ত বড় জমি মাফিয়া। জমি জবরদখল করতে সে পারে না হেন কাজ নেই। তাঁর মূল বাড়ি ছত্রিশগড়ে। কিন্তু এখন সে সল্টলেকের বাসিন্দা। সেখানে তার প্রাসাদোপম বাড়ি। আর বাগুইআটির এই বাড়িটা তার জবরদখল করা অনেক সম্পত্তির একটি। খাতায় কলমে দেখানো আছে, এটা একটা প্যাকিং বাক্স তৈরির কারখানা। কিন্তু কস্মিনকালে রামশংকর প্যাকিং বাক্স বানাত না, বানায়ওনি। কিন্তু এই বিরাট বাড়িটা রামশংকর এক ভদ্রলোককে ফাঁকি দিয়ে জবরদখল করে রেখেছে।

বেশ কয়েক বছর আগে এই বাড়ির একটা ঘরে মাস খানেকের জন্য সিমেন্ট রাখতে চেয়েছিল রামশংকর। তখন সে বাগুইআটিতেই একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি বানাচ্ছিল। বাড়ির মালিক অজিত সরকার প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু রামশংকরের বিশেষ অনুরোধে মাত্র দু-এক মাসের জন্য নীচের একটা ঘর খুলে দিয়েছিল। বলেছিলেন, কোনও ভাড়া দিতে হবে না। আপনি এত রিকোয়েস্ট করছেন, আমি আপনাকে এটুকু হেল্প করলাম।

সেই বাড়িতে সূচ হয়ে ঢুকে রামশংকর ফাল হয়ে বেরিয়েছে। বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার ফল্‌স রিসিট বানিয়ে পুরো বাড়িটাই সে এখন কব্জা করে বসেছে। বাড়ির মালিক আর ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারেনি। থানা কোর্ট ঘুরতে ঘুরতে মারা গেছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রীও অনেক ঘুরে ব্যর্থ হয়েছেন।

বাগুইআটির সেই বাড়িটায় সকাল দশটার সময় ঢুকে পড়েছে রামশংকর। তাকে বলা হয়েছে সঙ্গে কাউকে যেন না আনে। সিকিউরিটিও সরিয়ে দিতে। তবে একটু সে তৈরি হয়েই আসত। সে সবসময় তৈরি হয়েই থাকে।

রামশংকর দশটার আগেই চলে এসেছে। আরও একটু পরে চিন্ময়ী এল। ওর পরনে গাঢ় লাল রঙের সালোয়ার কামিজ। কপালে ছোট একটা টিপ। কাঁধে পাটের ঝোলা ব্যাগে বিস্তর কাগজপত্র, দুটো মোটা মোটা ফাইল। ডানকুনির দিকের একটা মস্ত বড় জমির যাবতীয় কাগজপত্র এতে আছে।

মেয়েটাকে দেখে রামশংকরের কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু চেনা হবে কী করে? রামশংকরকে এই কানেকশনটা করিয়ে দিয়েছে ওরই এক দেশয়ালি ভাই। সে অবশ্য টোটাল ডিলটা হয়ে যাওয়ার পর টু-পারসেন্ট কমিশন চেয়েছে। সে-ই সঙ্গে আসছে। জমিটা যার এই মেয়েটিই সেই মেয়েটি।

চিন্ময়ীকে বেশ খাতিরদারি করে রামশংকর ভেতরে নিয়ে গেল। বলল, 'সঞ্জয় যে কেন এখানে মিট করতে বলল বুঝলাম না। আমার অফিসে গিয়ে কথা বলতে পারতেন। এসি রুম ছিল,

আরামে বসা যেত।'

চিন্ময়ী বলল, 'না, আসলে আমি এখানে একজনের কাছে যাব। একটু দরকার আছে। তাই এদিকটাই আপনার অফিস আছে শুনে বললাম, এখানেই বসব।'

রামশংকর বলল, 'সঞ্জয় আসতে পারবে না বলছে—ওর মেয়ের শরীর ঠিক নেই। জানেন, ওর সঙ্গে আমার পনেরো বছর পরে দেখা হত। ওর মেয়ে আমাকে ফেসবুক থেকে খুঁজে বের করে দিয়েছে। ভালোই হয়েছে।'

চিন্ময়ী হাসল। বলল, 'কাজের কথায় আসি, ডানকুনির এই জমিটা আমার বাবার প্রপার্টি। জমিতে কোনও গোলমাল নেই। একদম ক্লিয়ার ল্যান্ড। কাগজপত্র আপনি ল'ইয়ারদের দেখিয়ে নেবেন। আমি সব সঙ্গে এনেছি। এই জমিটা বাবা আমাকে দিয়েছেন। টোটাল আট বিঘের প্রপার্টি। আমি ছ'বিঘে দিয়ে দেব। দু'বিঘে নিজের জন্য রাখব। আমি এটা বিক্রি করতে চাইছি। কিন্তু আমার কোনও ক্যাশ চাই না। ক্যাশের আমার কোনও প্রয়োজন নেই। তার বদলে বাকি আমার দু'বিঘে জমি ডেভেলপ করে— একটা তিনতলা স্কুল বাড়ি বানিয়ে দিতে হবে। আমি বাচ্চাদের একটা স্কুল করব। ও হ্যাঁ, আর একটা সুইপিং পুল করে দিতে হবে।

প্রস্তাবটা শুনে রামশংকরের চোখমুখ চকচক করে উঠল। বিশেষত তাকে যখন কোনও টাকা দিতে হবে না। রামশংকর বলল, 'এটা নিয়ে কোনও প্রবলেম হবে না। সব হবে।'

চিন্ময়ী সব কাগজপত্তর হস্তান্তর করে দিল। দিয়ে বলল, 'আপনার মোবাইল থেকে একটা ফোন করতে পারি? আমার ফোনটা গড়বড় করছে।'

চিন্ময়ী ফোন করল—খুব সাধারণ কথাবার্তা। একজন মানুষের ভালোমন্দের খোঁজ নিল। সেই সঙ্গে বলে দিল, সে বেশ কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছে। দু-তিন মাস তো হবেই। ফিরে সে দেখা করে নেবে। ফোনটা কেটে দিয়েও চিন্ময়ী ফোন ছাড়ল না। বলে

চলল—হিরেগুলো আমার সঙ্গে আছে, কিন্তু এখন তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। ভদ্র জীবনযাপন করতে হবে। তুমি যদি রাজি থাকো, আমি তোমার ভাগের হিরে তোমাকে দিয়ে দেব। নইলে সব বেচে দিয়ে গরিব মানুষদের টাকা বিলিয়ে দেব। বাবা আমাকে এই কথা বলে গেছে। তুমি ভাবো কী করবে?'

হিরের কথা শুনে কান খাড়া করে রামশংকর সোজা হয়ে বসল।

ফোনে কথা শেষ করে চিন্ময়ী এগিয়ে এসে রামশংকরের হাতে ফোন দিল। দিয়ে হেসে বলল, 'আমার দাদা—খুব খারাপ পাল্লায় পড়েছে। জুয়া খেলে সব শেষ করেছে, এখন পারিবারিক হিরেগুলো হাতিয়ে নেওয়ার জন্য পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যখন এখানে এলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও হানা দিয়েছে। কী মুশকিল বলুন তো?'

রামশংকর হাঁ করে চিন্ময়ীর কথা শুনছিল। মেয়েটাকে তার এত চেনা লাগছে কেন?

চিন্ময়ী বলল, 'এখন আমাকে আবার আধঘণ্টার জন্যে একটা জায়গায় যেতে হবে। আজ আবার ড্রাইভার আসেনি। খুব ঝামেলা আমার। দাদা এখন আমার পিছু নিয়েছে। হিরেগুলো ব্যাগে নিয়ে আমি ঘুরছি; বাড়িতে রাখার ভরসা পায়নি। আপনি আধঘণ্টার জন্যে আমার হিরেগুলো একটু রেখে দেবেন, আমি কাজ সেরে এসে নিয়ে যাব।'

রামশংকর ঢোঁক গিলল। বলল, 'জরুর!' সে উত্তেজিত, উঃ তার ছেলেবেলার বন্ধু সঞ্জয় তাকে কী কানেকশনটাই না দিয়েছে। সে একে ধরেই মালামাল হয়ে যাবে।

চিন্ময়ী ওর বটুয়া বের করল। খুলল, হাতের তালুতে হিরেগুলো বের করে রামশংকরকে দেখাল। বলল, 'এই দেখুন, প্রায় দশ কোটি টাকার হিরে আছে। আমি আজই এগুলো আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে সরিয়ে দেব। বাড়িতে আর রাখব না। এগুলো আপনি প্লিজ একটু রাখুন।

রামশংকর বটুয়া ভরা হিরেগুলো নিয়ে বুক পকেটে রাখল।

চিন্ময়ী বলল, 'আমার ফিরতে আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হবে। আপনার ফোন নম্বর আমার কাছে আছে। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। আর হ্যাঁ, আমার দাদা কিন্তু যে-কোনও সময় এসে হামলা চালাতে পারে। মাতাল আর জুয়ারি মানুষ। প্রথমে ভয় দেখাবেন। বলবেন—গুলি চালিয়ে দেব। ও আপনাকেও ভয় দেখাবে—বলবে আমি পুলিশের লোক। ওর কথায় ভুলবেন না যেন। তেমন বুঝলে একটা আধটা গুলি ছুড়ে দেবেন। দেখবেন যেন গায়ে না লাগে। ও পালিয়ে যাবে। ও গুলিকেই ভয় পায়, আমিও তাই করি। এই দেখুন আমাকে ব্যাগে করে রিভলবার নিয়ে ঘুরতে হয়।'

চিন্ময়ী ব্যাগ থেকে রিভলবার বের করে রামশংকরের নাকের ডগায় ঘোরালো। বলল, 'আমি তাহলে আসি। ওকে কিন্তু এখানে ঢুকতে দেবেন না। তাহলে ও ঠিক হিরেগুলো নিয়ে পালিয়ে যাবে।'

রামশংকর বলল, 'আরে ম্যাডাম, কোনও ভয় নেই—আমার কাছেও রিভলবার আছে। রামশংকরের কাছ থেকে হিরে নিয়ে যাবে এমন ক্ষমতা ওর নেই।'

কথা শেষ করে চিন্ময়ী হাসল। বলল, 'যতই হোক, দাদা তো—বড় ভালোবাসি। ও যদি ভালোমানুষ হত, তবে এই আটটা হিরে কেন, আমার ভাগের আটটা হিরেও ওকে দিয়ে দিতাম।'

রামশংকর বলল, 'কোনও চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন।'

চিন্ময়ী চুল ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চিন্ময়ী চলে যেতেই রামশংকর কোমর থেকে রিভলবার বের করে টেবিলে রাখল। তারপর বটুয়া খুলে তালুতে হিরেগুলো নিয়ে দেখতে লাগল। আটখানা হিরে। তার দু-চোখ ঝলসে যাচ্ছে। অন্য সময় হলে হিরেগুলো নিয়ে এখুনি রামশংকর ভেগে যেত।

কিন্তু আজ সে হিরেগুলো নিয়ে ভাগবে না। কারণ ডানকুনির এই জমিটার দাম অনেক। আগে জমিটা ম্যানেজ করুক, তারপর এই হিরেগুলোও সে ঠিক কব্জা করতে পারবে।

লোকেশনটা ট্রেস করা গেছে। এই কলকাতার বাগুইআটির দিকের একটা বাড়িতে। ট্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় জিরো টাইমে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল মধুবন্তী আর দুর্দান্ত সাদা পোশাকের পুলিশ। ওদের সঙ্গে ফুল লোডেড রিভলবার। বাইরে থেকে গেট বন্ধ। বাইরে একটা গাড়িতে মধুবন্তী একজনকে নিয়ে বসে থাকল। আরও কিছুক্ষণ গড়াল। মধুবন্তী নিশ্চিত এখানেই চিন্ময়ীকে পাওয়া যাবে। এমনও হতে পারে এটা কল্কিদের বড় কোনও আস্তানা। আজ চিন্ময়ীকে ধরলে হয়তো ১৪ ফেব্রুয়ারির ভ্যালেন্টাইন ডে-র বড় কোনও নাশকতা রোধ করা যাবে।

মধুবন্তী তীক্ষ্ণ চোখ বাড়ির গেটটার দিকে তাকিয়ে। গেটটা খুলে গেল। মধুবন্তী দুজনকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। মধুবন্তীকে পিছনে রেখে ততক্ষণে তিনজন সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে উঠতে শুরু করেছে। প্রথমজন দোতলায় উঠতেই রামশংকর হুংকার দিল—ভাগয়োঁ হিয়াঁসে—নেহি তো গোলি কর দেগা।'

অনঙ্গ দেব বলল,—'আমরা পুলিশের লোক—সিআইডি—সারেন্ডার করো।'

'ভাগ শালা হিয়াঁসে—পোলিশ—গোলি খায়গা? ভাগ!'

একজন দড়াম করে লাথি মেরে দরজা খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে গুলি ছুড়ল রামশংকর। সঙ্গে সঙ্গে পালটা গুলি ছুটল। সিআইডি অফিসার দেবাশিসের টিপ অব্যর্থ—মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রামশংকর।

এক গুলিতেই খেল শেষ!

ওরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চিন্ময়ীকে সারেন্ডার করতে বলল। মধুবন্তীর বিশ্বাস এই বাড়িতে নিশ্চিয়ই চিন্ময়ী আছে। নইলে এভাবে গুলি চলত না। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে পাওয়া গেল না। শুধু টেবিলের ওপর আটটা হিরে কাটিং করা কাচের টুকরো। আর ফাইল ভরা আজেবাজে কাগজ।

ওরা অবাক হয়ে গেল!

সবকিছু খতিয়ে দেখতে দেখতে মধুবন্তীর মনে হল, সে কোনও ট্র্যাপে পড়েছে। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। বেফালতু একটা লোকের প্রাণ গেল তাদের হাতে। এতক্ষণে মিডিয়ার কাছে খবর চলে গেছে। মিডিয়া এবার তাদের ছিঁড়ে খাবে। সে কোন টেররিজমের কথা বলবে?

হঠাৎই টিভি খুলেছিলেন মালতী সরকার। একা মানুষ। টিভিই ওর সঙ্গী। নিজের মতো করে চলে যায়। হালকা সাউন্ড দেওয়া থাকে। কিন্তু আজ—আরে কী আশ্চর্য! টিভিতে যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটা যে তাঁর বাড়ি। তাঁর বাগুইআটির বাড়ি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো! এই বাড়িটাই তো ওই বদমাইশ রামশংকরটা কব্জা করে রেখেছে মিথ্যে ভাড়ার বিল বানিয়ে।

আরে, রামশংকর খুন হয়েছে এই বাড়িতে। এবার নিশ্চয়ই বাড়িটা দখলমুক্ত হবে। ইস, এসময় যদি তাঁর স্বামী বেঁচে থাকতেন, কত খুশি হত!

তখনই মালতীর চিন্ময়ীর কথা মনে পড়ে যায়। চিন্ময়ী থাকলেও খুব খুশি হত। মেয়েটা এই বাড়িটার জন্যে কম জায়গায় দৌড়োয়নি! তার সঙ্গে কতদিন কোর্টে গেছে। থানা, পুলিশ করেছে। একবার তো ওই রামশংকরের অফিসে গিয়ে দেখা করে কথাও বলেছিল। কোনও কিছু হয়নি।

অনেকদিন পরে এমন আনন্দের দিনে...বার বার চিন্ময়ীর কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

মেয়েটা হঠাৎ যেন উবে গেল। ওর এক বন্ধু খুন হল। তারপর মেয়েটা সেই যে ল'ইয়ারের বাড়ি গেল আর ফিরল না। দু-দুবার পুলিশ এসে ওর খোঁজ করে গেছে। মালতী সরকার বলেছেন, চিন্ময়ী তার বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকত, তার বেশি কিছু সে জানে না। হ্যাঁ, তারা দুজনেই সরকার, কিন্তু কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই।

দুপুরের দিকে মধুবন্তীর কাছে সব ইনফরমেশনই চলে এসেছে—এই বাড়ির মালিক মালতী সরকার। বিধবা বয়স্কা মহিলা। একটা গার্লস স্কুলের রিটেয়ার্ড হেডমিস্ট্রেস। খুন হয়ে যাওয়া রামশংকর তাঁর বাড়িটা জবরদখল করে রেখেছিল। মালতীর পেয়িং গেস্ট ছিল চিন্ময়ী সরকার। চিন্ময়ী পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে, পুলিশকে দিয়েই রামশংকরকে আজ শেষ করাল। আর মধুবন্তীও অহেতুক একটা এনকাউন্টারের কেসে ফেঁসে গেল। এখানে কোনও টেররিজমের তত্ত্ব মধুবন্তী খাঁড়া করতে পারছে না। চেষ্টা করছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করছে না। এক ঢিলে চিন্ময়ী সরকার দু-দুটো পাখি মেরে গেল! মেয়েটার বুদ্ধির তারিফ না করে মধুবন্তী পারছে না।

ওদিকে চিন্ময়ী তখন কল্কির তিনজন সদস্যাকে ইন্টারনেটে মেসেজ লিখল...কোড ল্যাঙ্গুয়েজে। তাতে লেখা ছিল—টেররিজমের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব। কিন্তু সাধারণ মানুষের রক্তপাত চাই না! ১৪ ফেব্রুয়ারি অন্যভাবে ভাবতে হবে আমাদের।

কল্কির অদৃশ্য সদস্যর দুজন চিন্ময়ীর এ যুক্তি মানতে পারছে না। দুজনের মতামত—টেররিজমকে থামাতে গেলে সাধারণ মানুষের রক্তপাত হতেই পারে। এর জন্যে এত দুঃখ পেলে চলবে না।

চিন্ময়ীর মনে হচ্ছে তার রাস্তা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে...!

রামশংকর খুন হলে তার দুঃখ নেই। কিংবা একজন টেররিস্টকে সে নিজের হাতেই মারতে চায়। কিন্তু কোনওভাবে কোনও নিরপরাধ, সাধারণ মানুষের রক্ত দেখতে সে পারবে না।

চিন্ময়ী ব্যাগে রাখা খেলনা রিভলবারটা রাস্তার ধারে একটা গরিব বাচ্চার হাতে দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। ১৪ ফেব্রুয়ারি—তাদের অন্যভাবে ভাবতে হবে।

১১

হতচ্ছাড়া বৃষ্টি শেষ হওয়ার নাম নেই! সিদ্ধেশের ঠাকুরদার বাড়ি বিষ্ণু ভবনের সামনে জল জমেছে। শ্যাওলা জমে গাড়িবারান্দা পিছল হয়ে রয়েছে। বজরঙ্গী সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ ঝাঁটা দিয়ে শ্যাওলা সাফ করছে। বজরঙ্গীর বউ আরতি ব্যস্ত বাড়ি সাফাইতে।

বিষ্ণু ভবন তৈরি হয়েছিল গত শতকের পাঁচের দশকে। তখন বিম-কলাম স্ট্রাকচার চালু হয়নি। কড়িবরগার ছাদ। উঁচু সিলিং, খড়খড়ি দেওয়া জানলা, দরজার মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে লাল সবুজ কাচের ডিজাইন। মেঝেতে সাদা আর গাঢ় ছাই রঙের ইটালিয়ান মার্বেলের চৌখুপ্পি। বাড়ির সামনে শ্বেত পাথরের পরি।

যত্নের অভাবে আজ মার্বেলের মেঝেতে ফাটল। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। খড়খড়ি ভেঙে যাচ্ছে।

বিষ্ণু ভবন সারাতে গেলে অনেক টাকার ধাক্কা। সে টাকা সিদ্ধেশদের নেই। আবার এত ভালো বাড়ি ভেঙে বহুতল বানাতেও মন চায় না। উত্তর কলকাতার এই প্রাইম প্রপার্টিতে জমি হাঙরদের নজর আছে। সিদ্ধেশের বাবার কাছে রোজই প্রোমোটারদের ফোন আসে। বাড়ি বেদখল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে বজরঙ্গী আর আরতিকে রাখা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে বাড়ির দেখাশোনা করে। রোজ তিনঘণ্টা ঝাড়পোঁছ করলে তবে বাড়ি পরিষ্কার থাকে।

আরতি দোতলার পাখা সাফ করছে। কড়িবরগা থেকে লম্বা রড দিয়ে ঝোলানো আদ্যিকালের চার ব্লেডের সিলিং পাখা, দেওয়ালে ঝোলানো অ্যানসনিয়া ঘড়ি—এই সব সাফ করতে গেলে ঘড়াঞ্চিতে উঠতে হয়।

অ্যানসনিয়া ঘড়ির মাথা থেকে একটা মেটাল ক্যাপসুল বার করে ওয়েস্ট পাউচ বা কোমরে বাঁধা থলিতে ঢোকায় আরতি। এই ক্যাপসুল ছিল সিতি সান্যালের গোড়ালিতে। অনামিকা সাহার

গোড়ালিতে যেটা ছিল সেটা এখন সিআইডি-র হেফাজতে। তিন নম্বরটা নিয়ে একটু পরে চিন্নির আসার কথা।

ঝাড়পোঁছ সেরে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে পাড়ার অন্য বাড়ির ছাদে আর জানলায় চোখ বুলিয়ে নেয় আরতি। সিতির চার বন্ধুকে নজরবন্দি রেখেছে সিআইডি। এইআইএ-র নেটওয়ার্কও সক্রিয়। এরা কল্কির কলকাতার অফিসের কথা এখনও জানে না। যতদিন পারা যায়, বিষ্ণু ভবনকে পুলিশি সন্দেহের বাইরে রাখতে হবে।

ঘড়াঞ্চি ভাঁজ করে একতলায় নামে আরতি। কেয়ারটেকারের কোয়ার্টারে ঢোকে।

ফতুয়া আর লুঙ্গি পরা বজরঙ্গী ট্যাবলেট পি.সি.-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আরতিকে দেখে বলল, 'মৈনুদ্দিনের কাছে সিআইডি পৌঁছে গেছে।'

'কী করে জানলে?' সুইচ টিপে কম পাওয়ারের আলো জ্বেলে জানতে চায় আরতি।

আঠাশ বছরের আরতির জন্ম ঝাড়খণ্ডে। পড়াশোনা এবং বেড়ে ওঠা কলকাতা শহরে। কলেজে আলাপ সহপাঠী বজরঙ্গী ওরফে সঞ্জয় সিং-এর সঙ্গে। সঞ্জয়ের জন্ম পাটনায় হলেও স্কুল ও কলেজ কলকাতায়। ওরা দুজনেই চিন্নির ব্যাচমেট ছিল।

'মৈনুদ্দিনের বউ সিতারা মেল করেছে। ও আর ডক্টর প্রদীপ মিশ্র কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসছে। চিন্নিও টিকটিকিকে ঝেড়ে ফেলে আসছে। কল্কির কোর কমিটির এটাই লাস্ট মিটিং। এরপর আর আমরা নিজেদের মধ্যে দেখা করব না। সিতি আর অনামিকার জোড়াখুন কল্কিকে ভালনারেব্‌ল করে দিয়েছে।' জবাব দেয় বজরঙ্গী ওরফে সঞ্জয়। কল্কির সেকেন্ড ইন কমান্ড।

সঞ্জয় মুম্বাইয়ের ব্যাঙ্কে চাকরি করত। মৈনুদ্দিন সরকার ছিল তার সিনিয়র। মুম্বাইয়ের বোমা বিস্ফোরণে মৈনুদ্দিন মরেই যেত। লীলাবতী হসপিটালের সার্জন, ডক্টর প্রদীপ মিশ্র একাধিক অপারেশান করে মৈনুদ্দিনকে প্রাণে বাঁচায়। কিন্তু দু-পা খুইয়ে লোকটা পঙ্গু হয়ে যায়। মানসিক ভাবে একদম ভেঙে পড়ে। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়ে আর

কাউন্সেলিং করিয়ে সুস্থ হয়েছে।

মৈনুদ্দিন লীলাবতী হাসপাতালে ছিল প্রায় তিনমাস। সেই সময় নবি মুম্বাইয়ে মৈনুদ্দিনের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল চিন্নি। মৈনুদ্দিনদের বাড়ি ছিল চিন্নির মামাবাড়ির লাগোয়া। সেই সুবাদে চিন্নি আর মৈনুদ্দিনের অনেকদিনের আলাপ। চিন্নি মৈনুদ্দিনকে 'দাদা' বলে ডাকে। মৈনুদ্দিনের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকত সঞ্জয়। দিনের পর দিন সঞ্জয়ের ফ্ল্যাটে সিতারা, চিন্নি, আরতি আর সঞ্জয় আলোচনা করত, সন্ত্রাসবাদকে কীভাবে উপড়ে ফেলা যায়। মাঝে মাঝে চলে আসত ডক্টর মিশ্র। টেররিজ্‌ম যে এই মুহূর্তে মানবসভ্যতার এক নম্বর শত্রু, এই নিয়ে কারও কোনও সংশয় ছিল না।

সেই সব আলোচনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল গুপ্ত সংগঠন কল্কি। সন্ত্রাসবাদ দমন করা যার একমাত্র লক্ষ্য। ভারত সরকার নিজের মতো করে লড়াই করুক। কিন্তু সাধারণ মানুষেরও কিছু দায়বদ্ধতা আছে। কল্কি সেই দায়বদ্ধতার ফসল।

মৈনুদ্দিনের ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেওয়া হল। মৈনুদ্দিন আর সিতারা চলে গেল রসুলপুরের দেশের বাড়িতে। আরতি, সঞ্জয় আর ডক্টর প্রদীপ মিশ্র কলকাতায় চলে এল। সঞ্জয়ের ফ্ল্যাটে রয়ে গেল চিন্নি। মুম্বাই থেকে সিদ্ধেশকে ফোন করে বিষ্ণু ভবনে কেয়ারটেকার রাখার প্রস্তাব চিন্নিই দিয়েছিল। সঞ্জয় নিজের নাম বদলে বজরঙ্গী সিং হয়ে আরতিকে নিয়ে কেয়ারটেকারের কাজ শুরু করল। এবং বিষ্ণু ভবনকে কল্কির হেড অফিস বানিয়ে ফেলল। মাস ছয়েক বাদে কলকাতা ফিরে চিন্নি উঠল মনোহরপুকুরের পেয়িং গেস্ট অ্যাকমডেশানে। লীলাবতী হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডক্টর মিশ্র এখন কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছে।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর জন্যে অর্থ চাই, লোকবল চাই, বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার চাই। আর চাই বিশ্বাস। যে, আমরা পারবই।

ইনফ্যাক্ট, কল্কির জন্মমুহূর্তে বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু ছিল না। যে বিশ্বাস থেকে জঙ্গি সংগঠন উড়িয়ে দিয়েছিল টুইন টাওয়ার,

যে বিশ্বাস থেকে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছিল; তার থেকে কল্কির সদস্যদের বিশ্বাসের দূরত্ব সুতো পরিমাণ। কখন দুটো এক হয়ে যাবে, কেউ জানে না।

আদর্শগত প্রশ্নে বার বার ঝগড়া হয় নিজেদের মধ্যে। কিন্তু কল্কির কোর কমিটি এখনও নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল। ফাইট টেরর টিল ডেথ!

সিতারা চলে এসেছে। ভিজে ছাতা দরজার বাইরে রেখে চেয়ারে বসল। মৈনুদ্দিনের অ্যাক্সিডেন্টের পরে সিতারাও ডিপ্রেশানের স্বীকার হয়। ওষুধ খেয়ে এখন সুস্থ। মুম্বাইতে সিকিওরিটি এজেন্সির সফ্‌টওয়্যার প্রফেশনাল এখন রসুলপুরে স্বামীর সেবাযত্ন করে। পাশাপাশি কল্কির আইটি ডিভিশান সামলায়।

আরতির কাছ থেকে মেটাল ক্যাপসুল নিয়ে সিতারা বলল, 'এটা সিতির গোড়ালিতে ঢুকিয়ে রাখার ডিসিশান কে নিয়েছিল?'

'আমি।' ঘরে ঢুকেছে ডক্টর মিশ্র। বর্ষাতি খুলে বলে, 'দুটো ক্যাপসুল আমাকে দিয়ে চিন্নি বলেছিল, "এই রকম আরও একটা আসবে। ততদিন এগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে।" লাকিলি, তখনই সিতি আর অনামিকার গোড়ালিতে প্রবলেম হল। ওদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল চিন্নি। একই দিনে দুটো অপারেশান ছিল। আমি ক্যাপসুল দুটো ওদের গোড়ালিতে রাখি। তিন নম্বর ক্যাপসুলটা কি চিন্নি পেয়েছে?'

'হ্যাঁ। তালসারির হোটেলের ম্যানেজারের কাজ থেকে প্যাকেট পেয়ে গেছে।' বলে বজরঙ্গী, 'বাই দ্য ওয়ে, সিতির মার্ডার কেসে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়াটা খুব কাঁচা কাজ হয়ে গেছে ডাক্তার!'

'আমি ফুলবাগান থানার ওসি বিজিত দত্তর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি বকাবকি করতে বললাম, চিন্নির মাসি কান্নাকাটি করছিল বলে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হই। আমার যদিও আনন্যাচরাল ডেথ বলে মনে হয়নি। সাডেন কার্ডিয়াক অ্যাটাক এখন কমবয়সিদের মধ্যেও বেশ কমন...'

'সেকথা বিজিত দত্ত বিশ্বাস করেছে কি?'



'মনে তো হয়।'

'আমার মনে হয় না।' বলে সিতারা, 'তোমাকে আরও সাবধানে মুভ করতে হবে। আমি সিওর যে মধুবন্তী সেন তোমার পিছনে লোক লাগিয়েছে।'

'লোক তো চিন্নির পিছনেও লেগেছে।'

'তাকে ঝেড়ে ফেলার কায়দা চিন্নি জানে।'

'আমার প্রশ্নটা এইখানেই।' বলে ডক্টর মিশ্র, 'কল্কির শুরু থেকে আমি এর সঙ্গে যুক্ত। আমরা সবাই কলকাতা চলে আসার পরে চিন্নি মাসখানেক মুম্বাইতে থেকে গিয়েছিল। সেই সময়ে ও কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? আমরা কোত্থেকে এত ফান্ডিং পাচ্ছি? কারা আমাদের হাই এন্ড ইকুইপমেন্ট পাঠাচ্ছে? সন্ত্রাসবাদ দমনের এই নীল নকশার পিছনে কোনও সন্ত্রাসবাদী দল নেই তো? আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে যাচ্ছি না তো?'

ডক্টর মিশ্রর কথার মধ্যে চিন্নি ঢুকেছে। সপসপে বর্ষাতি পেরেকে ঝুলিয়ে, সিতারার হাতে একটা মেটাল ক্যাপসুল দিয়ে বলল, 'এইটা তালসারি থেকে পেয়েছি।' তারপর ডক্টর মিশ্রকে বলল, 'প্রদীপদা, তুমি কী বলছিলে আমি শুনতে পেয়েছি। একটা কথা খোলাখুলি বুঝে নাও। কল্কির জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছি আমি। বজরঙ্গীদা প্রেসিডেন্ট। সিতারাদি টেক সাপোর্ট। আরতিদি কনট্যাক্ট পারসন। আমার দাদা মৈনুদ্দিন ট্রেজারার। আর তুমি মেডিক্যাল সাপোর্ট।'

'সোজা করে বল না যে আমরা সবাই তোর কথা শুনে চলতে বাধ্য!' হো হো করে হাসে ডক্টর মিশ্র।

'বললেও শুনছ কই?' বিরক্তির সঙ্গে বলে চিন্নি, 'সিতি যে মরে গেছে সেটা কনফার্ম করতে তুমি ওর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে। সেটা আমাদের প্ল্যান ছিল। কিন্তু সিতির ফোন থেকে ছ'টা কুড়ি নাগাদ ওর ছোটমাসিকে ফোন করেছিলে কেন?'

ডক্টর মিশ্র চুপ করে থাকার পাত্র নয়। সে বলল, 'সিতি আর অনামিকাকে খুন কেন করা হল, এটাই তো আমার কাছে ক্লিয়ার

নয়! ওরা কি সন্ত্রাস ছড়াচ্ছিল?'

চিন্নি বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওরা নানা গোপন খবর টেররিস্ট আউটফিটকে বিক্রি করছিল।. ওদের মরতেই হত।'

'সিতি এরকম করেছে, তুই সিওর?' জানতে চায় ডক্টর মিশ্র, 'ওর কিন্তু সিভিয়ার ডিপ্রেশান ছিল। আমি ওকে সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন দিয়েছিলাম।'

'ডিপ্রেশানের সমস্যা নিয়েই ও প্রলয়েশদার কাছে গিয়েছিল। কল্কির কথা জেনে যাওয়ার পরে প্রলয়েশদা সিতিকে ব্ল্যাকমেল শুরু করে। আমি দেখলাম এই সুযোগ। আমিই প্রলয়েশদাকে দিয়ে প্ল্যানচেটের নাটক করাই। তার আগেই অর্কর ঠিকানায় ক্যুরিয়ার মারফত ওষুধের শিশি পাঠিয়েছিলাম। তাতে ছিল হেভি মেটাল আর্সেনিক। বাকি কাজ রক্তিম সেজে অনামিকা ফেসবুকে করেছিল। সিতি মরল। প্রলয়েশের জেল হল। এবার প্রলয়েশকে সরিয়ে দিতে পারলেই কল্কি আবার সিআইডি, এনআইএ বা কলকাতা পুলিশের স্ক্যানারের বাইরে চলে যাবে।'

ডক্টর মিশ্র উত্তেজিত হয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে সিতারা বলল, 'অনামিকার পায়ে ইমপ্ল্যান্ট করা মেটাল ক্যাপসুলটা কি এখনও সিআইডির কাছে? তিনটে ক্যাপসুল না পেলে আমি কাজ শুরু করতে পারছি না।'

'এই নাও।' সিতারার দিকে তৃতীয় মেটাল ক্যাপসুল এগিয়ে দেয় চিন্নি।'

'কী করে পেলে?' জানতে চায় ডক্টর মিশ্র।

'বিশুর কাছ থেকে।' জবাব দেয় চিন্নি।

'বিশু মানে সিআইডির টিকটিকিটা? যে তোমাকে ফলো করছিল?'

'হ্যাঁ! লোকটা কল্কির হয়ে কাজ করছে। মেট্রো রেলে ও আমাকে হঠাৎ হারিয়ে ফেলেনি। ইট ওয়াজ প্রিপ্ল্যান্ড। ভবানী ভবন থেকে মেটাল ক্যাপসুল চুরি করে ও-ই আমাকে দিয়েছে!'

'এই মেটাল ক্যাপসুলগুলো আসলে কী? এগুলো নিয়ে এত লুকোছাপা কেন? এগুলো কোথা থেকে আসছে?'

'এগুলো এসেছে ইজরায়েল থেকে। মেটাল ক্যাপসুলের মতো দেখতে হলেও এগুলো আসলে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বা ডেটা স্টোরেজ ডিভাইস।'

'যাকে আমরা চালু কথায় পেন ড্রাইভ বলি?'

'হ্যাঁ। পেন ড্রাইভের সমস্যা হল, ড্রাইভ যত ছোট হবে তত মেমরি কমবে। সাইজ বাড়লে মেমরি বাড়বে। আমাদের কাছে তিন খেপে তিনটে পেন ড্রাইভ এসেছে। এগুলো 'ডিওনেট' নামের এক ডাচ কোম্পানির তৈরি পৃথিবীর সব চেয়ে ছোট পেন ড্রাইভ। দুই মিলিমিটার বাই সাড়ে দেড় সেন্টিমিটার। মেমরি আট জিবি। আমাদের প্রাইমারি অপারেশানের জন্য যে মাস্টারপ্ল্যান মোসাদ তৈরি করে দিয়েছে, তা চব্বিশ জিবির। তাই তিনটে মেটাল ক্যাপসুল।'

'মোসাদ?'

'ইন্সটিটিউট অফ ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অপারেশান। এটা ইজরায়েলের ইনটেলিজেন্স এজেন্সি। এদের কাজের মধ্যে পড়ে ইনটেলিজেন্স কালেকশান, কভার্ট অপারেশান আর কাউন্টার টেররিজ্‌ম।'

'দেশের সন্ত্রাসবাদ রুখতে আমরা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি!'

'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র—এই প্রবাদ শোনোনি প্রদীপদা?' ক্রুর হাসি হাসে চিন্নি।

'ওসব কথা এখন থাক।' ল্যাপটপে প্রথম পেন ড্রাইভ গুঁজল সিতারা। সমস্ত ডেটা ট্রান্সফার করে পুঁচকে ড্রাইভকে গুঁড়িয়ে দিল।

চিন্নি বলল, 'আমি যখন পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে চাঁদিপুরের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন মোবাইলে অনামিকার সঙ্গে কথা বলি। ও লাউডন স্ট্রিটে বন্ধুর বাড়ি ছিল। সেই কথা সিআইডি এবং এনআইএ দুজনেই রেকর্ড করেছিল। তা না হলে তালসারিতে কে এম ইন্টারন্যাশনালে আমাদের হাইডআউট এনআইএ উড়িয়ে দিতে পারত না। ওখানে কল্কির সিনিয়ার অ্যাডভাইসার জ্যাকব আর এক কর্মী ওভিড ছিল। এনআইএ অ্যাটাক করার পরে দুজনে অনেকক্ষণ লড়াই চালায়। কিন্তু অতগুলো লোক নাইন এম এম নিয়ে একটানা ফায়ার করছে...ধরা

পড়ার আগে আগে জ্যাকব আর ওভিড আরডিএক্স ব্যবহার করে বাড়ি উড়িয়ে দেয়। নিজেরাও উড়ে যায়। আরতি ওখানে ছিল। ও কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। ওগুলো এনআইএ-র হাতে পড়লে আমাদের জারিজুরি এতক্ষণে ফাঁশ হয়ে যেত।'

ডক্টর মিশ্র বলে, 'কে এম ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিটার পুরো নাম কী? কল্কি মোসাদ ইন্টারন্যাশনাল?'

চিন্নি বলল, 'তা হয় তো নয়! কিন্তু ভেবে নিলেই বা ক্ষতি কী?'

বজরঙ্গী বলে, 'ওই অ্যাটাকের কথা এনআইএ কখনোই স্বীকার করবে না। এবং এই কারণেই সিআইডি ভাবছে, ওই এক্সপ্লোশান কল্কির কাজ। সিআইডির দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে রেড হেরিং!'

ডক্টর মিশ্র বজরঙ্গীকে বলে, 'আমাদের কাছে কোডেড মেসেজ আসে চিন্নির কাছ থেকে। কিন্তু চিন্নিকে কে মেসেজ করে? আই মিন, ''রাজপুতানি নারী'' লিখে মেসেজটা কে করেছিল?'

'জ্যাকব।' উত্তর দেয় চিন্নি, 'জ্যাকবের নির্দেশে আমি বিষ্ণু ভবনে বন্ধুদের নিয়ে দ্বিতীয় মিটিং-টা করি। জ্যাকবের নির্দেশে সিদ্ধেশের ব্যাগে গোপন চিঠি ভরে দিই। যাতে লেখা ছিল, 'আমাদের বন্ধুত্ব এত ঠুনকো নয়। পুলিশকে ধোঁকা দিতে ঝগড়া করলাম।' জ্যাকবের নির্দেশে আমি বারবার মোবাইল আর সিম বদলাচ্ছি। তোমাদের কোডেড মেসেজ করছি। শুধু তাই নয়। বজরঙ্গীদার বন্ধু, বাগুইহাটির রামশংকরকে ফেসবুকের সাহায্যে খুঁজে বার করা এবং পুরো ছকটাও কষে দিয়েছিল জ্যাকব।'

ডক্টর মিশ্র বলে, 'তুই আমাদের কোডেড মেল করেছিস। তাতে লেখা আছে, 'টেররিজ্‌মের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব। কিন্তু সাধারণ মানুষের রক্তপাত চাই না। ১৪ ফেব্রুয়ারি অন্যভাবে ভাবতে হবে আমাদের।' আরতি আর সিতারা তোর সঙ্গে একমত নয়। আমি একমত। কিন্তু লিডার যদি বারবার প্ল্যান বদলায়, তা হলে আমাদের

মতো দলীয় কর্মীদের অসুবিধে হয়ে যায়।'

চিন্নি বলল, 'ওটাও জ্যাকবের প্ল্যান। জ্যাকবের অ্যাবসেন্সে এবার কী হবে, কে জানে!'

'সিতারা বলল, 'আমার কাজ কমপ্লিট। তিনটে পেন ড্রাইভের ডকুমেন্ট এখন ল্যাপটপে। পুরো প্ল্যান চক আউট করা রয়েছে। এবার যা বলার চিন্নি বলবে।'

চিন্নি ল্যাপটপ কোলে নিয়ে বলল, 'এবার আমরা মিটিং-এর কাজ শুরু করব।'

ভবানী ভবনে নিজের চেম্বারে বসে সন্ধেবেলা গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ডিআইজি মধুবন্তী সেন। বৃষ্টির বিরাম নেই। ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলে গেছে। বাতিদানের আলো বৃষ্টির ফোঁটায় প্রতিফলিত হয়ে কুয়াশার বিভ্রম তৈরি করেছে। সেই কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছেন মধুবন্তী।

কুয়াশা কেটে আলো দেখা দেবে কি? মধুবন্তী কি কল্কির স্বরূপ উন্মোচন করতে পারবেন?

মধুবন্তীর সামনে, টেবিলের ওপ্রান্তে বসে রয়েছে অনঙ্গ। তার ভুরুতেও ভাঁজ। কিছুটা কল্কি রহস্যের সমাধান খুঁজতে, কিছুটা নিজের চেয়ার বাঁচাতে। জোড়া খুনের ঘটনায় সিআইডি যখন নাক গলায়, তখন অনঙ্গর মনে হয়েছিল যে কলকাতা পুলিশের অপদার্থতা ঢাকতে এই হাতবদল। তারপরে তালসারির বিস্ফোরণে আরডিএক্সের ব্যবহার, আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দুই বিদেশির মৃত্যু, এনআইএ আর ওড়িশা পুলিশের ইনভল্‌বমেন্ট, কল্কি নামের এক গোপন সংগঠনের খবর...সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মধুবন্তীর সামনে নিজেকে এফিসিয়েন্ট প্রমাণ করতে না পারলে কপালে দুঃখ আছে।

মধুবন্তী চশমা খুলে দিয়ে চশমার কাচ মুছে বললেন, 'লেট্‌স গো ব্যাক টু দ্য বেসিক্‌স, অনঙ্গ! আমাদের কাছে তিনটে হার্ড ফ্যাক্ট রয়েছে। এক নম্বর, মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশান চলে যেতে পারে

জেনেও ডক্টর মিশ্র ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে। লোকটা কেন এই কাজ করল? দু-নম্বর, বিশু বারবার চিন্নিকে হারিয়ে ফেলছে। কেন? তিন নম্বর, অনুরাধার পা থেকে পাওয়া মেটাল ক্যাপসুল খোদ ভবানী ভবন থেকে মিসিং। কেন?'

'আপনি বলতে চাইছেন এটা ইনসাইডার্স জব?'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। আমি ফ্যাক্ট বলছি।'

অনঙ্গ কাগজে হিজিবিজি কাটতে কাটতে বলে, 'এক নম্বর, ডক্টর মিশ্রকে কাস্টডিতে নেওয়া উচিত।'

'আই বেগ টু ডিফার। আমার মতে ওকেও ফলো করা উচিত। বোথ ফিজিক্যালি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্যালি।'

'আচ্ছা ম্যাডাম।' কপাল থেকে ঘাম মোছে অনঙ্গ। দু-নম্বর বিশুর বদলে দেবাশিসকে চিন্নির পিছনে লাগানো উচিত।'

'বিশুকে দিয়ে কী করাতে চাও?'

'ওকে ডক্টর মিশ্রর পিছনে লাগাই। বিশু হয়তো চিন্নির মতো ডক্টর মিশ্রকেও হারিয়ে ফেলবে!'

'ভালো বলেছ।' অনঙ্গর প্রশংসা করেন মধুবন্তী, 'বিশুর পিছনে লাগাও নতুন কাউকে। যাকে বিশু চেনে না। পাশাপাশি বিশুর ফোনও মনিটর করো। আর কিছু মাথায় আসছে?'

'মৈনুদ্দিনকে নজরে রাখলে হয়...'

'রাখতে পারো! বাই দ্য ওয়ে, চিন্নি দেশ ছেড়ে পালাবে না তো?'

'এয়ারপোর্ট আর বর্ডারের চেকপোস্টে ইনফর্ম করা আছে। মনোহরপুকুরে যে পিজিতে ও থাকত, সেটা আনডার সারভ্যাইল্যান্স। ওখানে ও আর ফিরতে পারবে না।'

'গুড! আর একটা রাস্তাই পড়ে আছে। প্রলয়েশকে আর একবার জেরা করতে হবে। আমরা ঠিকঠাক প্রশ্ন করতে পারছি না বলে পাঁকাল মাছের মতো পালিয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিকঠাক প্রশ্ন বলতে?'

'ফুলবাগান থানার বিজিত ওকে জেরা করেছিল সিতির মার্ডার

আর প্ল্যানচেটে ড্রাগের ইউজ নিয়ে। চিন্নি, সিতি, কল্কি...এইসব প্রসঙ্গ ওঠেনি। এই বিগ পিকচার মাথায় রেখে একবার ওর সঙ্গে কথা বলব।'

'কালকেই ব্যবস্থা করি ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ। শুভস্য শীঘ্রম!' চেয়ার ছেড়ে ওঠেন মধুবন্তী।

চিন্নি বলল, 'কল্কি কাউন্টার-টেররিজ্‌মের সেল। এর মাথায় মোসাদ। ওরা যা বলবে, আমরা তা শুনব। মোসাদের তরফে জ্যাকব তালসারিতে বসে আমাদের কাজ মনিটর করছিল। সে এখন মৃত। মোসাদের নির্দেশ এসেছে, এখান থেকে আমিই পুরো অপারেশানের দায়িত্বে।'

সবাই নিঃশব্দে হাততালি দিলেও ডক্টর মিশ্র চুপ।

চিন্নি বলল, 'প্রদীপদা, আমার কথা পছন্দ হল না?'

'না রে!' সোজাসাপটা জবাব ডক্টর মিশ্রর। 'আমি কল্কিতে যোগ দিয়েছিলাম, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। অন্য দেশের এজেন্ট হতে নয়। তোরা আমায় ছেড়ে দে।'

'কল্কিতে ঢোকা যায়। বেরোনো যায় না!'

'জানি। কল্কির সঙ্গে গদ্দারি করলে কী হয় সেটা সিতি আর অনামিকা ভালোই বুঝেছে। তাও আমি প্রাণভিক্ষা চাইছি!'

'তুমি কল্কির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে একজন। তোমার জন্যে নিয়ম ভাঙতে রাজি আছি। তবে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আগামীকাল প্রলয়েশের সঙ্গে দেখা করে একটা পার্সেল দিতে হবে। এতে ওর হাই ব্লাড প্রেশারের ওষুধ রাখা আছে। আর, আমি আশা করব যে তুমি বিজিত দত্তকে গলগল করে সব বলে দেবে না।'

'প্রমিস!' হাত জোড় করে বলে ডক্টর মিশ্র। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বজরঙ্গী ডক্টর মিশ্রর হাতে একটা পার্সেল ধরিয়ে বলে, 'ডাক্তার, তিনটে কথা মনে রেখো। পালাবার চেষ্টা কোরো না। আমাদের



ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। আর, পার্সেলটা খুলো না।'

'আচ্ছা!' বর্ষাতি গলিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ডক্টর মিশ্র।

সিতারা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ? ওকে ছেড়ে দিলে?'

'চিন্নি ঠান্ডা গলায় বলল, 'মিটিং-এর পরের অ্যাজেন্ডা, প্রলয়েশ।'

সিতারা বলল, 'প্রলয়েশকে সরাতে হবে। প্রদীপদার মতোই এই লোকটাও পোটেনশিয়াল থ্রেট।'

আরতী বলল, 'দুজনকে সরাবে কী করে?'

চিন্নি বলল, 'দেখা যাক!'

অলক্ষুণে বৃষ্টি থামার নাম নেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বাদলের ধারাপাত দেখতে দেখতে ডক্টর মিশ্র ভাবছিল, মুক্তি কি সত্যিই পাওয়া গেছে? যে-কোনও মুহূর্তে চিন্নি বা আরতি বা সিতারা বা বজরঙ্গী তাকে খুন করে যাবে না তো? কলকাতা পুলিশকে সব ইনফর্ম করে রাজসাক্ষী হওয়া বেটার অপশন, না মুখ বুজে থাকা?

মন বলল, চুপ থাকাই বেটার। তাতে মুক্তির সম্ভাবনা আছে। সব স্বীকার করলে দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনিবার্য।

ফুলবাগান থানায় গিয়ে প্রলয়েশের হাতে ওষুধের পার্সেলটা ধরালেই মুক্তি। সেই কাজ করবে? না বিজিত দত্তকে সব বলে দেবে? ডক্টর মিশ্র মনস্থির করতে পারছে না।

মোবাইলে মেসেজ ঢুকল। 'রিচ ফুলবাগান থানা অ্যাট নাইন এ এম শার্প।' প্রেরকের মোবাইল নম্বর নেই।

'ওয়ে টু এস.এম.এস.' বা ওই জাতীয় পোর্টালে বেনামে অ্যাকাউন্ট খুললে যে-কোনও মোবাইল নম্বরে কম্পিউটার থেকে মেসেজ পাঠানো যায়। কোন কম্পিউটার থেকে এই মেসেজ

জেনারেট হয়েছে, তা কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল কোনও দিনও ধরতে পারবে না। কল্কির ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, ডেস্কটপে মাস্কিং করা আছে। ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস খুঁজে বার করা অসম্ভব ব্যাপার।

মোবাইলে সময় দেখে ডক্টর মিশ্র। আটটা বাজে। এক্ষুনি বেরোতে হবে।

স্নান ও আনুষঙ্গিক সারতে পনেরো মিনিট। জলখাবার খেতে আরও দশ। গিন্নি জয়িতা বলল, 'এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?'

ডক্টর মিশ্র উত্তর দিল না। জয়িতা বলল, 'কলকাতায় আসার পরে তুমি আর আগের মতো নেই। অনেক বদলে গেছ!'

'কথা না বাড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় ডক্টর মিশ্র। গাড়ি চালিয়ে চলে আসে ফুলবাগান থানায়। তাকে এত সকালে থানায় ঢুকতে দেখে বিজিত বলল, 'ডক্টর মিশ্র, বৃষ্টির সকালে কী মনে করে?'

ডক্টর মিশ্র বলল, 'একবার প্রলয়েশের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'হঠাৎ?' বিজিতের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'প্রলয়েশের হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আছে। আমি ওর জন্যে ওষুধ নিয়ে এসেছি।' পার্সেল বার করে ডক্টর মিশ্র বলে, 'আমি না গেলেও চলবে। আপনি হাবিলদারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিন।'

বিজিত চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনি দিয়ে আসুন। পুলিশ কাস্টডিতে অত ফরমালিটি লাগে না।'

ডক্টর মিশ্র গারদের সামনে দাঁড়াল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে প্রলয়েশ। ডক্টর মিশ্রকে দেখে একলাফে গারদের গরাদের কাছে এসে দাঁড়ায় সে। ডাক্তারবাবু কেন থানায় এসেছে? তা হলে কি সে পুলিশের হাত থেকে কি ছাড়া পাবে?

ডক্টর মিশ্র বলে, 'তোমার জন্যে ওষুধ নিয়ে এসেছি। রোজ রাতে একটা করে বড়ি খেয়ো।'

পার্সেল এগিয়ে দেয় ডক্টর মিশ্র। প্রলয়েশ ফ্যাঁশ করে পার্সেলের খাম ছেঁড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে থানায় বিস্ফোরণ হয়! দাউদাউ করে

আগুন জ্বলে ওঠে। কালো আর নীলচে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। স্প্লিনটার আর শার্পনেলের আঘাতে প্রলয়েশ আর ডক্টর মিশ্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এক্সপ্লোশানের অভিঘাতে হাবিলদার ছিটকে পড়ে গেছে। বিজিত নিজের চেয়ার থেকে উড়ে গিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে পড়ে গেল। থানায় আগুন লেগে গেছে। পুরো বাড়ি থরথর করে কাঁপছে। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। আশেপাশের বাড়ি আর দোকান থেকে লোকেরা দৌড়ে আসছে। দমকলে ফোন করছে। থানার সামনে ভিড়...

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চিন্নি আর বজরঙ্গী হাই ফাইভ করে। চিন্নি বলে, 'একে বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। দুজনকেই মরতে হত। পার্সেল বোমার মতো সিম্পল এক্সপ্লোসিভ যে কত কাজে দেয়!'

বজরঙ্গী বলল, 'তাড়াতাড়ি বিষ্ণু ভবন চলো। সামনে অনেক কাজ!'

১২

মাঘের শেষ। ফাল্গুন আসছে রং নিয়ে। তার মধ্যেও বৃষ্টির ধারাপাত চলছে মাঝেমধ্যে।

মধুবন্তী সেনের মাথায় হাজার চিন্তা। আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ হলেও কেস ক্রমশ জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।

অনেক অনেক মানুষ জড়িয়ে আছে এই কেসটিতে। সাদা কাগজের ওপর স্মৃতি থেকে হাতড়ে প্রথম থেকে একেক করে নামগুলো লিখছেন মধুবন্তী। এটা একটা পুরোনো অভ্যাস তাঁর। স্মৃতিশক্তির ওপর ভরসা করেন।

চিন্নি, সিতি, সিদ্ধেশ, মেরুন, প্রলয়েশ...মেঘনা...অর্ক, অনামিকা, রক্তিম—এই পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন মধুবন্তী।

আপন মনে উচ্চারণ করলেন, 'মেঘনা! মেঘনা!' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন কিছুক্ষণ। মনে মনে বললেন, মেঘনা কোথায় গেল? হোয়্যার ইজ দ্যাট গার্ল? চিন্ময়ীর. পেছনে পড়ে আছি সবাই। বাট মেঘনা? নিরুদ্দেশ! কান্ট বি।

সেই মুহূর্তে ফোনটা এল। 'ম্যাডাম, ফুলবাগান থানায় ভয়াবহ ব্লাস্ট হয়েছে। জ্বলছে থানা।

রুমে রাখা টেলিভিশনের পর্দায় চোখ ঘুরে গেছে তার নিমেষেই। সাইলেন্ট মোড এ রাখা সেট-এ ব্রেকিং নিউজ!...ব্রেকিং নিউজ!

মস্তিষ্ক প্রখর হয়ে উঠেছে মধুবন্তীর। ফুলবাগান থানা মানে সেখানে প্রলয়েশ আছে। কোর্টের কাছ থেকে বিশেষ পারমিশন নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কাস্টডিতে রাখা হয়েছে। তার মানে প্রলয়েশ জীবিত নেই! তার মানে প্রলয়েশকে সরিয়ে দেওয়া হল! তার মানে প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইছে খুনিরা। অস্থির পায়চারি করছেন মধুবন্তী। জানেন এখনই অনঙ্গদেব আসবেন। অনঙ্গের সঙ্গে আজ একান্তে মিটিং-এর সময় ধার্য হয়েছিল সাড়ে এগারোটা!

ভাবতে না ভাবতে হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত অনঙ্গদেব। 'ম্যাডাম! গুড মর্নিং। ঘটনা—'

কথা শেষ করতে দেন না মধুবন্তী, বললেন, 'জানি।'

টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে তখনও থানা জ্বলছে। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে গেছে। আরও আসছে। উৎসুক জনতার ভিড়। ঘুরে ফিরে জনতার দিকে টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ!

অনঙ্গ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মধুবন্তী হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ তাঁর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। নজর ছড়িয়ে থাকা জনতার ওপর। অপরাধতত্ত্ব বলে অপরাধী ঘটনাস্থল থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে না। হয়তো এই ভিড়ের মধ্যেই—!

অনঙ্গ এর মধ্যেই বললেন, 'কী ধরনের এক্সপ্লোসিভ বোঝা না গেলেও—'

মধুবন্তী টেলিভিশনের পর্দা থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বললেন, ‘চোখ রাখুন স্ক্রিনে। জনতার ভিড়ে—’ বলতে বলতে মোবাইল ক্যামেরায় খটখট্ কিছু দৃশ্য বন্দি করে ফেললেন এক নিমেষে। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। মুখ থমথমে, গম্ভীর। ছবিগুলো দেখছেন মধুবন্তী। অনঙ্গ উৎসুক। প্রশ্ন করা যাবে না এখন বুঝতে পারছেন। তবে কিছু ক্লু যে পেয়েছেন মধুবন্তী, সে বিষয়ে নিশ্চিত তিনি। ছবিগুলো ল্যাপটপে আপলোড করলেন মধুবন্তী। আর অনঙ্গদেবকে বললেন, ‘যা ভেবেছিলাম, চিন্ময়ী! দেখুন, ওর পাশেই আরেকজন—।

মনে মনে অনঙ্গ মধুবন্তীর পর্যবেক্ষণ শক্তির তারিফ না করে পারলেন না।

বিক্ষিপ্ত জনতার ভিড়ে চিন্ময়ী। আর তার সঙ্গের লোকটিকেও তো চেনা চেনা লাগছে। স্মরণশক্তি দপ্ করে জ্বলে উঠল অনঙ্গর। ইয়েস বিকাশ। বিকাশের সঙ্গে একদিন লোকটাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে দেখেছিল কাঁকুরগাছির মোড়ে। তিনি তখন বাইক নিয়ে পাস করছিলেন। লোকটাকে মনে রাখার একটা কারণ, চকচকে টাক আর বেমানান একটা মোটা গোঁফ। যাকে দেখলেই অপছন্দ হবে যে-কোনও মানুষের। লাফিয়ে উঠলেন অনঙ্গ, বললেন, ‘এই লোকটাকে ম্যাডাম বিকাশের সঙ্গে দেখেছিলাম!’

গম্ভীর মুখ মধুবন্তীর। মাথা নাড়ছেন ধীরে ধীরে। বললেন, আপনি ঘটনাস্থলে চলে যান। মিটিং ক্যানসেল; আর এই ছবির প্রিন্ট আউট দিচ্ছি। ছবি ছড়িয়ে দিন।

অনঙ্গর মস্তিষ্কের অদৃশ্য এক কুঠুরি থেকে জানান দিল এই সময়েই, লোকটাকে সিদ্ধেশের বাড়ির গেটেও দেখেছেন তিনি একবার। সেইবার তিনি নিজেই শ্যাডো করেছিলেন মেঘনাকে।

—ইয়েস ম্যাম, লোকটাকে সিদ্ধেশের বাড়িতেও একবার দেখেছি।

—সিদ্ধেশের বাড়ির পাশ থেকে কি আমাদের লোক সরিয়ে নেওয়া হয়েছে?

—বলতে পারছি না। ওটা বিকাশের ওপর ভার ছিল।



ঠান্ডা চোখে তাকালেন একবার মধুবন্তী—। বললেন, 'আপনি চলে যান স্পটে।'

খবর চলে এল দশ মিনিটের মধ্যে সরাসরি মধুবন্তীর কাছে। ও.সি বিজিত দত্তকে হাসপাতালে রিমুভ করা হয়েছে। একমাত্র জীবিত ব্যক্তি তিনি।

সকাল সকাল বলেই থানায় তখন লোক কম ছিল। বিজিত দত্তর আজ মর্নিং শিফ্‌ট ছিল বলেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন। দুজন কনস্টেবল ছিল। তারা স্পট ডেড। থানার অধিকাংশই পুড়ে গেছে।

লক আপ-এ প্রলয়েশ ছাড়া আর দুজন ছিঁচকে চোর ছিল, তারাও স্পট ডেড।

দাঁতে দাঁত ঘষলেন মধুবন্তী।

টেলিভিশনের খবরে কান পাতলেন আর সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান করে নিলেন অবশ্য কর্তব্যগুলো।

আজ পুরো দিন পুলিশ এইসব নিয়ে থাকবে—বেশ বুঝতে পারছেন মধুবন্তী। হয়তো কারুর মাথাতেই আসবে না এই মার্ডার কেসটার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এই বিস্ফোরণ!

অনঙ্গ কিছুক্ষণ পরেই ফোন করলেন, জানালেন ছবির কপি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধেশের বাড়ির আশেপাশে পুলিশ সাদা পোশাকে রয়েছে।

মধুবন্তী আচমকাই বললেন, 'বাট মেঘনা নামেও এদের সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। সে কোথায়? আমরা চিন্ময়ীর পেছনে দৌড়োচ্ছি, কিন্তু জলজ্যান্ত মেয়েটা ভ্যানিশ?

ফোনের ও-প্রান্তে মাথা চুলকাচ্ছেন অনঙ্গদেব।

সত্যিই তো পরপর ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটছে যে সাসপেক্টদের একজনের কথা বেমালুম ভুলেই গেছেন তারা!

মধুবন্তী ফোনেই নির্দেশ দিলেন, 'ফাইন্ড হার। কাল সকালেই আমার রিপোর্ট চাই।

আজ অন্য পুলিশ বা গোয়েন্দা কর্তাদের সঙ্গে কোনও মিটিং নেই বলেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন মধুবন্তী। ও.সি বিজিত দত্তকে পি.জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থির করে নিলেন নিজেই যাবেন বিজিতের সঙ্গে দেখা করতে। কারণ এরপর ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রণ দুষ্কৃতিদের হাতে চলে যাবে। অতএব একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না।

পার্সোনাল সেক্রেটারি মহুয়া বিশ্বাসকে জানিয়ে দিলেন, বেরোব। আজ আর অফিসে নাও ফিরতে পারি।

পরনে সালোয়ার কামিজ, মধুবন্তী যখন ট্যাক্সি থেকে নামলেন পি.জি হাসপাতালের সামনে তখন চেনা জানা লোক ছাড়া কেউ বলবে না তিনি ডাকসাইটে গোয়েন্দা প্রধান। ক্ষিপ্র গতির জন্য বিখ্যাত তিনি।

এই মুহূর্তে চারদিকের ভিড় ঠেলে বার্ন ইউনিটে পৌঁছোতেই চোখে পড়ল পুলিশের আধিক্য।

তাঁকে দেখা মাত্রই চমকে গেছে পুলিশ। বিনা নোটিশে একেবারে একা খোদ গোয়েন্দা প্রধান। বিস্মিত হতেও সময় লাগল বুঝি তাদের। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি। কিছু অফিসারকে তাঁর নিজের উপস্থিতির বিষয়টা গোপন রাখতে বলে সোজা বিজিত দত্তর কেবিনে প্রবেশ করলেন মধুবন্তী।

বিজিতকে এক ঝলক দেখে নিয়ে একটু স্বস্তি বোধ করলেন মধুবন্তী। এক দেখাতেই বুঝে নিয়েছেন বিজিতের অবস্থা ততটা গুরুতর নয়। স্যালাইন চলছে তাঁর। মাথায় ব্যান্ডেজ। ডান হাতে ব্যান্ডেজ।

চোখ বন্ধ ছিল বিজিতের। নার্স দুজন বললেন, ইনজুরি তেমন কিছু নয়। কিছু স্প্লিন্টার ছিটকে এসে হাতে আর পায়ে আঘাত করেছিল। সামান্য বার্ন। তবে মাথায় লেগেছে।

—কথা বলা যাবে?

ঘাড় নাড়ল নার্স মেয়েটি। বলল, 'সিডেটিভ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ডক্টর। উনি রিফিউজ করলেন। ওনার ধারণা যে ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবেন বড় কর্তারা। উনি ঘুমিয়ে পড়লে হেল্প করতে পারবেন না।'

কথাবার্তার মধ্যেই বিজিত চোখ খুলে তাকিয়েছেন। স্বয়ং মধুমন্তীকে দেখতে পেয়েই উঠে বসার চেষ্টা করলেন।

উঠতে হবে না। 'পাশেই টুলে বসলেন মধুবন্তী, বললেন, 'উত্তেজিত হবার কিছু নেই। রিল্যাক্স।'

একটা ভীষণ ঘোর নিয়ে তাকিয়ে তখনও বিজিত। উত্তেজিত সে। স্পষ্ট বললেন, আমি ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিলাম ম্যাডাম—কীভাবে সে আর মনে নেই। মাথাটা ঠুকে গেছিল...'

—ক'জন স্টাফ ছিল মর্নিং-এ?

—কনস্টেবল পার্থ সাহা, অনাদি সাহু বোধহয় আর নেই! ওরা ওই ডক্টর মিশ্রকে গারদ পর্যন্ত নিয়ে গেছিল! সকালে তখনও আর কেউ আসেনি। বুঝতেই পারেন তো,....!

—ডক্টর মিশ্র! আই মিন প্রদীপ মিশ্র!

—ইয়েস ম্যাডাম।

—উনি এসেছিলেন কেন? উনি কোথায় যখন ব্লাস্ট হয়?

—সম্ভবত উনিও—! ঠিক ন'টা পাঁচ-দশ হবে, উনি এসে বললেন প্রলয়েশকে মেডিসিন দিতে হবে। ওর প্রেশার হাই। আমি কোনও সন্দেহ ছাড়াই হাবিলদারকে বললাম ওনাকে নিয়ে যেতে—। তারপর চার-পাঁচ সেকেন্ড হবে বোধহয়—। এত জোর ব্লাস্ট যে আমি ছিটকে....কী করে যে বেঁচে গেলাম ম্যাডাম—।

গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর মুখ মধুবন্তীর। মাথা নাড়ছেন শুধু। কেবিন থেকে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় ফোন দুটো করে নিলেন। তারপর সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

গন্তব্য বিযুক্তভবন। আর দেরি করলে চলবে না।

জনতার ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে একটি সুলভ টয়লেটে ঢুকল চিন্ময়ী।

বজরঙ্গী ওরফে সঞ্জয় ততক্ষণে বিষ্ণুভবনের দিকে চলে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি শাড়ি পরে এক মাথা সিঁদুর দিয়ে ঘোমটা টেনে সে-ও বেরিয়ে পড়ল। আর দেরি করা যাবে না। আজকেই ফাইনাল মিটিং সেরে আপাতত গা ঢাকা দেওয়া।

ট্যাক্সিতে বসেই যখন পরবর্তী স্ট্র্যাটেজির ছক কষছেন তখনই ফোন এল অনঙ্গ দেবের। 'ম্যাডাম টাক মাথা এই দশ মিনিট হল বিষ্ণুভবনে ঢুকেছে।'

'দশ মিনিট। বাড়ি থেকে বেরোনোর আর কোনও রাস্তা নেই তো?'

'না ম্যাডাম। চারদিকেই আমাদের লোক আছে। বলতে বলতেই উত্তেজিত অনঙ্গর কণ্ঠস্বর, 'ম্যাডাম দেহাতি টাইপের একটা বউ এইমাত্র ঢুকল। একটু সন্দেহজনক। হাইট-টা যেন চিন্ময়ীর মতো।'

ঠিক পথেই এগোচ্ছেন বুঝেই মধুবন্তীর চোখে সামান্য হাসির আভাস এই মুহূর্তে। বললেন, 'ঢুকতে দিন যারা যারা ঢুকছে। বেরোতে যেন কেউ না পারে। আমি আসছি। আর হোয়াট অ্যাবাউট বিশু? তার ওপর কেউ আছে তো?'

'ইয়েস ম্যাডাম। তবে বিশুকে আজ এখানে পাঠাইনি ইচ্ছা করেই।'

'গুড। আমি আসছি। আপনি ঠিক কোথায়? আপনাকে কেউ দেখেনি তো? আপনার মুখ কিন্তু ওদের চেনা!

হাসলেন অনঙ্গ, বললেন, 'আমাকে দেখলেও কেউ চিনতে পারবে না। মেক-আপ করে নিয়েছি। আপনার দুপুরের ফোন পাবার পরেই আমি ছাতুওয়ালা হয়ে গেছি। বিষ্ণুভবনের বাড়ির রাস্তার মুখে ছাতিম গাছটার তলায় ছাতু মাখা বিক্রি করছি। আমার খদ্দের কনস্টেবলরা। ওদেরই একজন ওই দুজনকে বিষ্ণুভবনের ভেতরে

ঢুকতে দেখে এসেছে।

'গুড।' থমথমে মুখ মধুবন্তীর। কোনও উত্তেজিত মুহূর্তেও তাকে উত্তেজিত দেখায় না। শুধু শান্ত সরল মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

ট্যাক্সি চলছে। এই সময় জনপথ ব্যস্ত। চিন্তা আর পরিকল্পনা উভয়ই ঝড়ের গতিতে চলেছে মধুবন্তীর মাথায়।

১. বিষ্ণুভবনই হল কল্কির মেইন কার্যালয়। সিদ্ধান্তে উপনীত তিনি।

২. অর্থাৎ সিদ্ধেশ জড়িত।

৩. মেরুন? প্রশ্ন রয়ে গেল মাথায়।

৪. সিতি মৃত। অনামিকা মৃত। প্রলয়েশ ও ডাক্তার মিশ্রও খতম।

৫. মেঘনা?

৬. রক্তিম কে? সেই প্রশ্ন ধাঁধার মতো। অনামিকা না মেঘনা?

৭. মেঘনা অর্ককে সিতির ফ্ল্যাটে নিশ্চয়ই দেখেছিল এবং আলাপ হয়েছিল। না হলে অর্ককে ব্যবহার করল কী করে?

৮. অর্ককে ইনটারোগেট করতে হবে আবার।

৯. তার আগে অপারেশন বিষ্ণুভবন।

অনঙ্গকে আবার ফোন করলেন মধুবন্তী।

আজই বিষ্ণুভবন অপারেশন। ব্যবস্থা রেডি রাখুন। আমি আর দশ মিনিটেই পৌঁছোব।

বিষ্ণুভবনের আন্ডার গ্রাউন্ড রুমে তখন কয়েকটি মাথা জড়ো হয়েছে।

বেশ পুরোনো আমলের এই বাড়ির আর্কিটেকচারটি বেশ গোলকধাঁধার মতন। অনেক ঘর। অনেকগুলো অলিন্দ। অনেক জটিল সিঁড়ি একে অন্যকে সংযোগ করেছে। একটা বাড়িরই পাঁচটা ছাদ! আর একতলায় পেছন দিকে বড় হলঘরের দেওয়াল থেকে নেমে এসেছে কয়েকটা সিঁড়ি! এই সিঁড়ির শেষ প্রান্তে আরও একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছোটখাটো ফ্ল্যাট যেন!

আজ এইখানেই জড়ো হয়েছে সবাই।

চিন্ময়ী এখনো পোশাক পরিবর্তন করেনি। মিটিং শেষ হলে এই পোশাকেই বেরিয়ে যাবে সে প্ল্যান করেছে। স্টেশনে এসে কালো বোরখা পরে নেবে। মুর্শিদাবাদে চলে যাবে সোজা। ওখানে গ্রামে মাদ্রাসায় অপেক্ষা করছে তার জন্য দলের লোকজন। মইনুদ্দিন আর সিতারা অলরেডি মুর্শিদাবাদের পথে।

মইনুদ্দিনদের বিষ্ণুভবনে আসার প্ল্যান শেষ মুহূর্তে সেই বাতিল করে দিয়েছে।

'লেটস স্টার্ট আওয়ার মিটিং?'

চিন্ময়ী বলার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধেশ আজ উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল, 'চিন্ময়ী নাউ টেল আস হোয়্যার ইজ মেঘনা? মেঘনার কোনও ট্রেস নেই কেন?

চিন্ময়ী টেবিলের ওপর সজোরে চাঁটি মেরে উঠল সহসা, বলল, 'হোয়াট ডু য়ু মিন? এতই যদি প্রেমের সম্পর্ক থাকে তো খুঁজে বার করো। সে কোথায় গেল হাউ ডু আই নো?'

'তুমিই তো সব করছ সেইদিনের পর থেকে। পুরো প্ল্যান চক আউট থেকে তাকে মেটিরিয়ালাইজ করা...এভরিথিং। তাহলে তোমার মনে প্রশ্ন আসছে না কেন মেঘনার ব্যাপারে?'

ঠান্ডা চোখে তাকাল চিন্ময়ী সিদ্ধেশের দিকে। হাড়হিম করা শীতল দৃষ্টি। সে বলল, 'জানতে চেয়েছ, জানতে পারবে সময় হলেই। তার আগে নিজের মাথা বাঁচাও। আমরা আর একঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ব বিভিন্ন প্রান্তে। আজকের থানা ব্লাস্টের পর পুলিশ মরিয়া।'

'আমাকে জড়িও না আর এর মধ্যে।' বলে উঠল সিদ্ধেশ। 'আমার বাড়িটা এবার ছেড়ে দাও তোমরা। কারণ ব্যাপারটা এত কমপ্লিকেটেড আমি বুঝিনি। মেরুন আমার ভালো বন্ধু, ও রিকোয়েস্ট করেছিল বলেই—। দাদুর বয়স পচানব্বুই; এইসব হচ্ছে বাড়িতে

বুঝতে পারলে হার্টফেল করবে। আর কল্কি যেভাবে খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়ছে—। আমি ছাপোষা মানুষ—।'

বজরঙ্গী আর আরতি ততক্ষণে সিদ্ধেশের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চিন্ময়ীর ইশারায়।

সিদ্ধেশ তা খেয়াল করতেই বলে উঠল, 'কী ব্যাপার? তোমরা আমার পেছনে?

'নাথিং ভাই। ভয় পেও না।' বজরঙ্গী ওরফে সঞ্জয় বলে উঠল।

চিন্ময়ী বলল, 'আমাদের চলে যাওয়া পর্যন্ত তুমি সাপোর্ট দেবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?

—ও.কে.।

চিন্ময়ী আরতিকে বলল, 'গুছিয়ে নাও সব। জলদি। আর সিদ্ধেশ আপাতত তোমাকেও আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। পরে ছেড়ে দেব। কারণ এই মুহূর্তে পুলিশের হাতে তুমি যদি পড়ো, আই মিন আবার ইন্টারোগেট করবেই, তখন আমাদের বিপদ। তাই তোমাকে ছাড়া যাচ্ছে না এখন। বাট কথা দিলাম ছেড়ে দেব।'

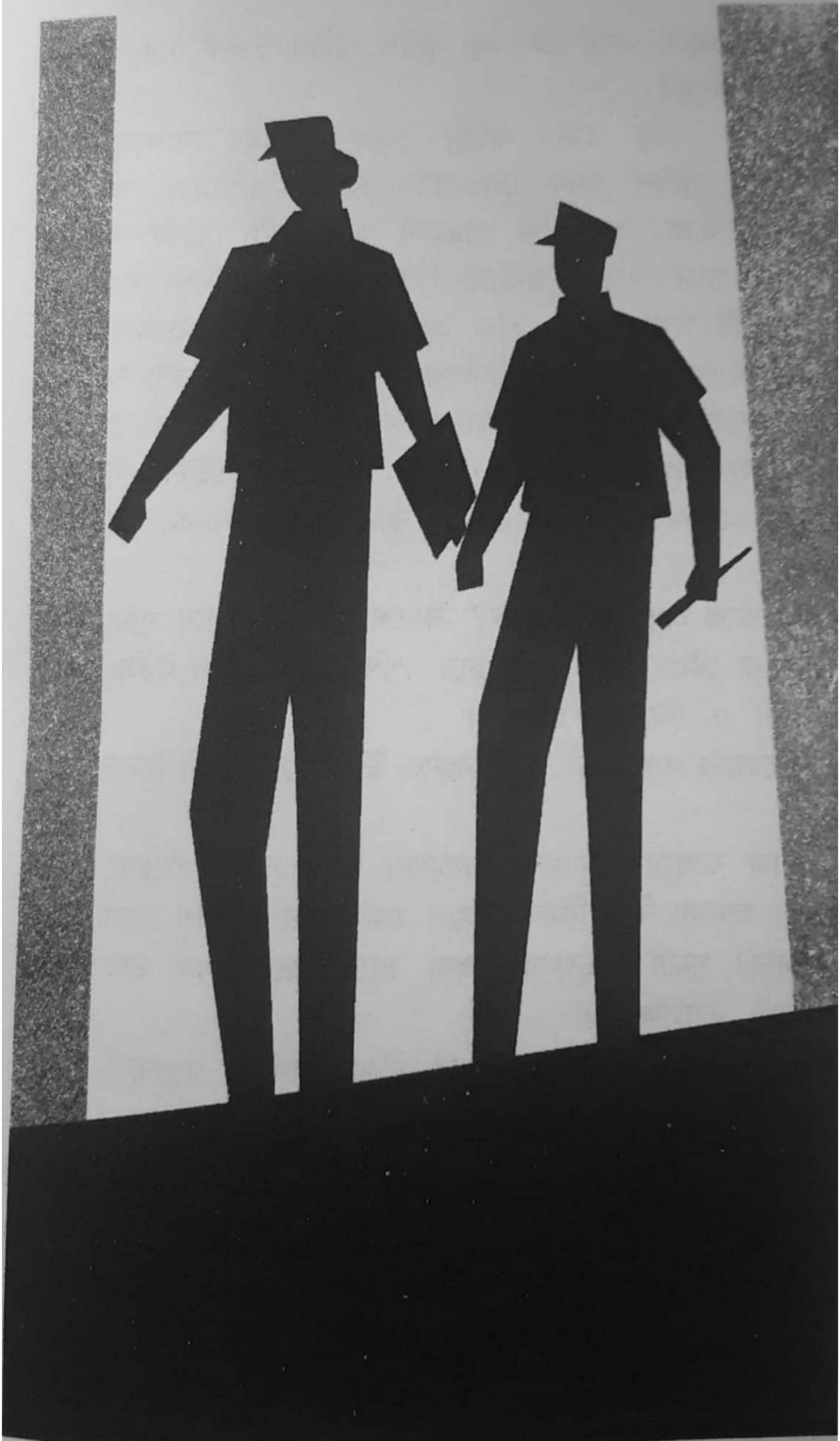
'মেঘনা?'

হো হো করে হাসছে চিন্ময়ী, 'বলল, 'উফ্, কী প্রেম! তোমাকে তো পাত্তাই দিত না ও। লোভী মেয়ে! কী ক্যারিয়ারিস্ট ! কল্কির সুপার হেড হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল! তোমার খোঁড়া পা নিয়ে সে হাসত, বুঝলে?'

অন্ধকার হয়ে গেল যেন সিদ্ধেশের মুখ নিমেষে। এই শারীরিক ত্রুটি বড্ড লজ্জায় ফেলে রাখে। মেঘনার উচ্ছ্বল প্রাণবন্ত চেহারাটা মনে পড়ে গেল তার। অপমানিত মুখটা নীচু হয়ে গেল।

মধুবন্তীর নির্দেশে তিনি উপস্থিত হবার আগেই পুলিশের কিছু বড় কর্তা সমেত বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলেছে গোটা পাড়া ও বিষ্ণুভবনকে।

মধুবন্তী উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে বাড়ির দরজায়



করাঘাত পড়ল, অন্যদিকে কিছু পুলিশ পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছে কর্তাদের হুকুমে।

অতবড় বাড়ি তখন বাইরে থেকে নিঃঝুম। নিঃশব্দে প্রায় কয়েকজন পুলিশ যখন দোতলার বারান্দায় পৌঁছেছে, আরতির মুখোমুখি তারা। আরতিকে অ্যারেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই আরতির দেখানো পথে আন্ডার গ্রাউন্ডে গিয়ে হাতবাক পুলিশমহল।

বজরঙ্গী অর্থাৎ সঞ্জয় তার প্রসাধন পর্বটা শুরু করেছিল সবে। টাকের ওপর ঝাকড়া চুল লাগিয়ে তা পনি বাঁধার চেষ্টা করছিল। আর চিন্ময়ী ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত, উত্তেজিত তার কণ্ঠস্বর।

অফিসার মিস্টার সীতেশ বাগচীর কানে শুধু এইটুকু পৌঁছোল, 'ইয়েস মালদহ, বুলবুল ডাঙা। কামালভাই থাকবেন মাদ্রাসায়, তুমি...।

'য়ু আর আন্ডার অ্যারেস্ট।' সীতেশ বাগচীর গর্জনে পুরো ঘরটা যতটা না কেঁপে উঠল তার চেয়ে বেশি জোরে কেঁপে উঠল চিন্ময়ী, বজরঙ্গী ও সিদ্ধেশ। হতবাক।

সারেন্ডার করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তখন তিনজনেরই।

আজ ফাল্গুনের আকাশ মেঘমুক্ত। ঘুম ভেঙেই পায়ের কাছের খোলা জানালা দিয়ে নির্মল উজ্জ্বল এক টুকরো আকাশ চোখে পড়ল মেঘনার। মনটা কিছুক্ষণের জন্য ভালো হয়ে গেল তার। কিন্তু ওইটুকুই ভালোলাগা!

ঘুম ভাঙার পরপরই হাজার চিন্তার জটিল গল্পগুলো তাকে আক্রমণ করে। অস্থির লাগে তার।

তখনই কয়েকটা খবরের কাগজ আর ট্রেতে করে চা বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে ঢুকল মেরুন।

মেরুনের মুখে-চোখে উত্তেজনা, বলল, 'সি, গো থ্রু দ্য পেপার। চিন্নি, সিদ্ধেশ, বজরঙ্গী, আরতি সকলেই অ্যারেস্টেড!'

ঘুমের ঘোর ঝেড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠেছে মেঘনা, 'হোয়াট! কখন? দেখি দেখি।'

সমস্ত খবরটি পড়তে দশ সেকেন্ডও লাগল না মেঘনার। বলল, 'তারপর? আমি আর কতদিন এই হাইড আউটে? তুই বল? এভাবে কতদিন লুকিয়ে থাকব মেরুন?'

'চা খা।' গম্ভীর মুখ মেরুনেরও। নিজেও চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চিন্তিত মুখে বলল, 'দেখ, ডোন্ট মাইন্ড, যে কাজে তোরা যুক্ত হয়েছিলি সেটা তো আদৌ দেশ উদ্ধারের জন্য ভালো কোনও পথ হতে পারে না। তার দায় তো তোকেও নিতে হবে মেঘনা। এতদিনে তুই তো খুন হয়ে যেতে পারতিস। যদি আমাকে সব খুলে না বলতিস। চিন্নিরা তোকে কীভাবে যে হন্যে হয়ে খুঁজছিল! সিতির মার্ডার আমি তো ভুলতে পারি না!'

'তার জন্য আমাকে দায়ী করছিস কেন? আমার ওপরে নির্দেশ ছিল। না হলে পুলিশকে জানিয়ে দিত আর গোটা দলটাই ধরা পড়ে যেতাম তখনই!'

'পড়তিস! তবু তো মেয়েটা বাঁচত।' ক্ষোভ ঝরে পড়ল মেরুনের কণ্ঠস্বরে।

মাথা নীচু করে পায়ের নখ খুঁটছে মেঘনা। চোখে-মুখে ভয়ের আশঙ্কা। আনমনেই বলল, 'রাজসাক্ষী হয়ে যাই। কী বলিস?'

'গুড, গুড আইডিয়া।'

'আমার তো সাজা হবে তাও। একটু কম হবে। তুই এই খুনিটার জন্য অপেক্ষা করবি তো?' আলতো করে চোখ তুলে তাকাল সে।

'করব। সিতি আমার গুড ফ্রেন্ড ছিল। চলে গেল বিনা অপরাধে। তোদের কার্যকলাপ জানতে পেরেছিল বলে। তারপরেও তুই যখন আমাকেই ভরসা করে সারেন্ডার করলি তোর ভরসাকে অমর্যাদা করিনি। তোকে ভালোবাসতাম। পছন্দ করতাম। সিতি যদি আমায় ভরসা করে সব বলত, আজ এই সুন্দর সকালটা থেকে বঞ্চিত হত না!' দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ল মেরুনের বুক ভেঙে।

'স্যরি! আমার ক্ষমা হয় না জানি। দেখ, আমার বাবা-মা নেই। একগাদা সম্পত্তি রেখে দুজনেই চলে গেলেন আমায় দিদার

কাছে ফেলে রেখে। আমি একলা বড় হলাম। আমার দাদু ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন।'

'জানি। সব বলেছিস।'

'হুম্। অনামিকাদির সঙ্গে যখন আলাপ হল, ওর আদর্শের কথা শুনে দ্রুত মুগ্ধ হলাম। বললাম, আমি এতবড় সম্পত্তি একা ভোগ করতে পারব না। বিবেকে লাগছে। তোমাদের কাজে ডেডিকেট করলাম নিজের জীবন। আমার সম্পত্তি কল্কিকে দান করব।'

'জানি। আবার কেন রিপিট করছিস?

'প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত।'

'অনামিকাদি ছিল এখানকার হেড।'

'শোন, আজই তুই আমার সঙ্গে যাবি। গেট রেডি। স্নান করে নে। ব্রেক ফাস্ট দিতে বলছি ঠাকুমাকে। খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তুই আমার ঠাকুমার একটা সাদা শাড়ি একেবারে ঘোমটা দিয়ে ঢেকে পড়বি। বলা যায় না আর কে কোথায় অপেক্ষা করছে! সোজা মধুবন্তী সেনের কাছে সারেন্ডার। রাইট?'

ঘাড় নাড়ল মেঘনা।

শান্তি নেই এত বড় ব্রেক থ্রু হবার পরেও মধুবন্তী সেনের।

প্রাথমিক জেরা পর্বের পরও নিশি নন এই কল্কির সম্পূর্ণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে। বিশেষ করে চিন্ময়া মেয়েটি যে অতিশয় বুদ্ধিমতী ও ধূর্ত তা তার কথা থেকেই অনুমান করতে পেরেছে তারা।

গতকাল সারারাত জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে। তবু মেয়েটা ভেঙে পড়েনি, এতটাই স্ট্রং নার্ভ তার!

বজরঙ্গী ওরফে সঞ্জয় আর আরতি দুজনে দুইরকম গল্প ফেঁদেছে। যদিও আজ সকালে অফিসে এসেই খুশি মধুবন্তী। কারণ ইতিমধ্যে সঞ্জয়ের আর আরতির প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছে অফিসাররা।

সঞ্জয় ঝাড়খণ্ডের নকশাল নেতা বিক্রমের ভাই। এবং সে-ও এই নকশালাইট মুভমেন্টের সঙ্গে ভালোভাবে জড়িত। সক্রিয় সদস্য।

আরতি সঞ্জয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী। কলেজে সহপাঠী ছিল এরা। কিন্তু কলেজে পড়াকালীনই পরিবারের পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে তার অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। পরে এই মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে মুম্বাইতে চাকরি করার সময়েই। মহারাষ্ট্রের দলীয় কার্যকলাপের ভার তখন তার হাতে চলে যায়। সেই সময় আরতির সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয় এই মুভমেন্টের মাধ্যমেই। আরতির ভাই ও আরতি দুজনেই কলেজ জীবনের শেষ দিকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। পরে আরতিকে বিয়ে করে সঞ্জয়।

এই গ্রুপটাই তাদের কার্যকলাপ সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার জন্য একটি শাখা গ্রুপ খোলে। যার নাম কল্কি!

অফিসারদের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পেয়েই নড়েচড়ে বসেন মধুবন্তী। 'যাক, রহস্যের অনেকটাই উদ্ধার করা গেছে।'

অনঙ্গদেবকে আজ অনেক খুশি দেখাচ্ছে। সম্পূর্ণ অপারেশনটার নেতৃত্বে ছিলেন তিনি আর সীতেশ বাগচী।

অনঙ্গ বললেন, 'ম্যাডাম, কলকাতায় ওদের আর কেউ আছে কি না—'

থামিয়ে দিলেন মধুবন্তী, বললেন, 'কাল রাতেই অ্যারেস্ট হয়েছে মালদহের মাদ্রাসা থেকে কামালউদ্দিন গাজি সহ পাঁচজন। আর বড় নিউজ মইনুদ্দিন আর সিতারাদেবী নামে আরও দুজন যারা বেশ কিছু টেররিজমের সঙ্গে জড়িত, ওরা-ও অ্যারেস্টেড। কলকাতা থেকেই বাই কার আজ ভোরে ওই মাদ্রাসায় পৌঁছেছিল!'

ঘনঘন ব্রেকিং নিউজ আসছে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে।

মধুবন্তী হাসলেন, বললেন, 'যে ঘটনা আমি এখন বললাম সেটা তো আরও দু-ঘণ্টা আগেই নিউজ হয়ে গেছে। আপনার নলেজে

থাকা উচিত ছিল।'

মাথা নীচু করে ফেললেন অনঙ্গ, বললেন, 'আই এগ্রি।'

দফায় দফায় জেরা চলছে ভবানী ভবনে। টানা বাইশ ঘণ্টা জেরার পর এবার চিন্ময়ী নার্ভের কাছে পরাজিত হল।

'সিতিকে মার্ডার কে করল?'

'অনামিকার নির্দেশে মেঘনা রক্তিম নাম নিয়ে অর্ক নামের একটি ছেলেকে দিয়ে পয়জন পাঠিয়েছিল।'

'মেঘনা রক্তিম, না অনামিকা?'

'রক্তিম।'

'অনামিকা কে?'

'চায়নাতে ওর হাজব্যান্ড আছে, এইটুকু জানি। এখানকার উইং-য়ে ওই হেড।

'আমরা তো জানি আপনি হেড?'

'ওর ডেথ-এর পর। ওর হাজব্যান্ডের ও চায়নার দপ্তরের নির্দেশে।'

'তা হলে সিতিকে খুন করলেন আপনি?'

'না। মেঘনা আর অনামিকা।'

'মেঘনা কোথায়?'

'জানি না।'

'মেরুন আপনাদের মেম্বার?'

'না।'

'সিদ্ধেশ?'

'মেম্বার না। প্রলয়েশদা আর আমি, স্পেশ্যালি মেঘনা ওর ব্রেন ওয়াশ করেছিল।

'যেমন?'

'মেঘনাকে নিয়ে যেদিন প্রথম ওর বাড়িতে যাই, সেইদিনই বুঝেছিলাম মেঘনার প্রতি ও আকৃষ্ট হয়েছে।'



'আর সেই দুর্বলতা কাজে লাগিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ! মেঘনা আমাদের আদর্শ ওকে বুঝিয়েছিল।'

'অনামিকা মরল কেন?'

'জানি না।'

'আমি যদি বলি দলীয় হেড হবার জন্য আপনি ওকে মেরেছেন?'

'না।'

'সেইদিন আপনি যে ড্রেসটা পরেছিলেন তা তো আমাদের কাছে এখন।' কঠিন দৃষ্টি মধুবন্তীর।

মাথা নীচু হয়ে গেছে চিন্ময়ীর।

'মারলেন কেন?'

'ওর হাজব্যান্ডের নির্দেশে। ওদের মধ্যে কিছু প্রবলেম শুরু হয়েছিল।'

'আমি যদি বলি, এই উইং-এর হেড হওয়ার লক্ষ্য ছিল আপনার, তাই—।'

'আমি হতাম না হয়তো! মেঘনা হত হেড। ওদের চয়েজ ছিল মেঘনা।'

ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়ে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন মধুবন্তী, 'হ্যালো!'

'ম্যাডাম, মেরুন চ্যাটার্জি আর মেঘনা সরকার নামে দুজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। জরুরি দরকার বলছে।'

মেঘ না হতেই বৃষ্টি যেন! চমকে উঠেছেন মধুবন্তী। বললেন, 'ওপরে পাঠিয়ে দিন। গেস্টরুমে বসতে বলুন। দেরি করবেন না। দে আর ইমপর্ট্যান্ট।'

রিসিভার রাখতে রাখতেই অনঙ্গকে নির্দেশ দিলেন, 'নীচে দুজন এসেছে। আপনি এখুনি চলে যান।'

চিন্ময়ী একটু উশখুশ করে উঠল। তার মনে প্রশ্ন, কে এল আবার? তাদের দলের আর কেউ? আর কে? কলকাতায় তো আর কেউ নেই! মেঘনা? তাকে তো চিরুনি তল্লাশি করে খুঁজেছিল সে আর সঞ্জয়। পায়নি। অদ্ভুতভাবে মেয়েটা হাওয়া হয়ে গেল! মনের

মধ্যে হওয়া অস্বস্তির প্রকাশ হচ্ছে তার মুখে-চোখে।

'হ্যাঁ, মেঘনা সরকার। তার কী হল চিন্ময়ী?'

'জানি না।'

'তাকেও তো সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বোধহয়।'

চিন্ময়ী চুপ। পাশেই বসে আছে সিদ্ধেশ। সে ঘামছে শুধু।

'আচ্ছা সিদ্ধেশ আপনি জানেন না মেঘনা কোথায়?'

'না। না।'

'কিন্তু শ্মশান থেকে আপনি আর মেঘনাই তো ক্যাপসুলগুলো আনতে গেছিলেন? চুন্নু ডোম তো তাই বলেছে।'

শীতল স্রোত নামছে সিদ্ধেশের শিরদাঁড়া বেয়ে। বুঝল অস্বীকার করার উপায় নেই। মাথা নাড়ল সে শুধু।

'মেঘনার প্রতি দুর্বলতা থেকে, না কি কল্কির কাজকর্ম, আদর্শ ভালো লেগেছিল বলে এই কাজে মেঘনার সঙ্গে ছিলেন?'

'মেঘনাকে বাঁচাতে। আমি চাইছিলাম ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরিয়ে আনতে। ইনফ্যাক্ট পরের দিকে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিল।'

'সিদ্ধেশ, আপনি মানেন তো রক্তিমই হল মেঘনা? মেঘনার বাড়ি ভবানীপুরে। ওর দিদিমার বাড়ি। মেঘনা অর্ককে সিতির ফ্ল্যাটে দেখার পরেই অর্কর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেসবুকে। ঠিক তো?'

'এটা আমি জানি না। মেঘনা আমায় কিছুই বলত না, বিশ্বাস করুন।'

'তা হলে আপনার বাড়িটা এদের ডেন হয়ে গেল কী করে?'

সঞ্জয়ের দিকে ভীত চোখে তাকাল সিদ্ধেশ এক পলক। বলল, 'সঞ্জয়জি আর আরতিজিকে আমার বাড়িতে চিন্ময়ী কাজের লোক হিসাবে ফিট করেছিল। যাতে আমার ওপর আর আমার বাড়ির ওপর কন্ট্রোল রাখা যায়। আমার দাদুকে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়েছিল ওরা। আমার কিছু করার ছিল না।'

'চিন্ময়ী! সিদ্ধেশ তাহলে ঠিক বলছে?'

মুখে কুলুপ এঁটে বসে চিন্ময়ী। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তার মুখের

চোয়াল আবার।

অনঙ্গদেবের ফোন এল মোবাইলে তখন। চেম্বারে নিয়ে যান বলে ফোনের লাইন কেটে দিলেন মধুবন্তী।

উপস্থিত আরও তিনজন গোয়েন্দা অফিসারকে ইনটারোগেট করার নির্দেশ দিয়ে লিফ্‌টে করে ওপরে চলে এলেন তিনি।

ভবানীভবন আজ উত্তাল। সংবাদপত্র আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকরা উত্তেজিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু 'ক্লু'-এর সন্ধানে শকুনের মতো সন্ধানী তারা।

অন্যদিকে অফিসারদের তৎপরতা দেখার মতো।

শুরু হয়ে গেছে জিজ্ঞাসাবাদ। অনঙ্গ মধুবন্তীর নির্দেশমতো প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। মেরুন আর মেঘনাকে এই প্রথম দেখলেন মধুবন্তী। রুমে প্রবেশ করেই মেঘনাকে অন্যরুমে নিয়ে যেতে বললেন মধুবন্তী।

মেরুণকে আগে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তিনি।

'মেরুন রায়, কী করেন আপনি?'

'এম.বি.এ করে এখন একটা প্রাইভেট হাউসে আছি।'

'মেঘনাকে কোথায় পেলেন?'

'ম্যাডাম, মেঘনা রাজসাক্ষী হতে চায়।'

'আচ্ছা!' ডানদিকের ভ্রূ একটু ওপরে তুলে তাকালেন মধুবন্তী। 'আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক?'

'স্রেফ বন্ধুত্ব ম্যাডাম। আমি সব খুলে বলছি।'

তীক্ষ্ণ এক্সরে আই মধুবন্তীর। পাথরের মতো চোখে তাকিয়ে আছেন।

ঘামছে মেরুন। খুবই ত্রস্ত বোঝা যায়। সামনে রাখা জলের গেলাস থেকে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে, মুখ মুছে বলতে শুরু করল, 'আমি আসলে কল্কির ব্যাপার কিছুই জানতাম না। প্রলয়েশদার কাছে আসা আমার চাকরি কবে হবে জানার জন্য। পাশ করে বসেছিলাম...'

'বলে যান।'

'সিতি আমার স্কুলমেট ছিল। বরাবর ফার্স্ট গার্ল। স্কুলের পর ওর আলাদা স্ট্রিম হয়ে গেল। ও সায়েন্স। আমি কমার্স। মাঝখানে যোগাযোগ ছিল না। তারপর আবার থ্রু ফেসবুক যোগাযোগ। আবার দেখাসাক্ষাৎ।'

'সিতি খুন হবার দিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'প্রলয়েশদার বাড়িতে। একটা প্ল্যানচেট হবার কথা ছিল।'

'সিতির সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক?'

'মাথা নীচু করল মেরুন। ঠোঁট কাঁপছে তার, চোখে পড়ল মধুবন্তীর। চোখের জল সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে সে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'ভালোবাসতাম।'

'প্রেম?'

'হুম। তবে ওর দিকে অত স্পষ্ট ছিল না। ওর মা-বাবা উত্তরপ্রদেশে থাকতেন। ও এখানে একাই থাকত।'

'ও কল্কির কথা কিছু বলেছিল?'

'না। তবে ও একটু আপসেট ছিল। মাঝে মাঝে আমার থেকে টাকা ধার নিত। আমি প্রশ্ন করিনি কখনো এ ব্যাপারে।'

'আচ্ছা, আর মেঘনা?'

'কল্কির হেড হবার কথা ছিল মেঘনার। কিন্তু চিন্নি সেটা হতে দিতে চাইছিল না।'

উত্তেজনার চোটে নাগাড়ে বলে যাচ্ছিল কথাগুলো মেরুন। 'ও আসলে ফেঁসে গেছিল ম্যাডাম।'

'আপনাকে বলল কেন এসব কথা?'

'তাহলে সেই সন্ধেবেলায় ফিরে যেতে হয় ম্যাম।'

মেঘনাকে চেম্বারে প্রবেশ করতে দেখে এতটাই চমকে উঠল চিন্ময়ী সে উত্তেজনার ক্রিয়ায় চেয়ার থেকে স্প্রিং-এর পুতুলের মতো উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সমস্ত নার্ভ নিমেষে শিথিল হয়ে গেল তার। কাটা গাছের মতো ধপ্ করে পড়ে গেল।

'চিন্ময়ী! একে চেনেন?' মধুবন্তীর কথাগুলো সূচের মতো বিঁধছে যেন চিন্ময়ীর বুকে।

'হুম।'

'তাহলে সিতি অনামিকার পর মেঘনা ছিল টার্গেট আপনার?'

'সিতিকে আমি খুন করিনি। ও করেছে।'

'কল্কির নির্দেশ? তাই তো?'

চিন্ময়ী নির্বাক। চুপ।

'ধরে নিলাম টেররিজমকে নির্মূল করার জন্য আরেক ধরনের আদর্শ বেছে নিয়েছিল কল্কি; আর সেটাও টেররিজমই! বিষে বিষক্ষয় বা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। মানলাম আদর্শ। কিন্তু ক্ষমতা দখলের লোভে আপনি নিজের গ্রুপের মেম্বারকেই মার্ডার করলেন? মেঘনার কাছ থেকে আমরা শুনেছি আপনি ওকে কীভাবে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। এবার আপনি বলুন?'

চুপ। চিন্ময়ী চুপ।

'চিন্ময়ী, মেঘনার ফ্ল্যাটে পয়জন কে রেখে এসেছিল? কার হাত দিয়ে—? আমরা উর্মিলাকে অ্যারেস্ট করতে পাঠিয়েছি। এখনই এসে পড়বে সে।'

অবিচল, অনড় চিন্ময়ী। মুখে কুলুপ।

'চিন্ময়ী!'

'আমি উর্মিলার হাতে দিয়ে এসেছিলাম। জানতাম উর্মিলা ওর কাছে অনেক বছর ধরে রান্নার কাজ করে। বিশ্বস্ত।'

'কত টাকার বিনিময়ে?'

'টেন থাউজেন্ড।'

হাসলেন অনঙ্গ, বললেন, 'ম্যাডাম বিশ্বাসের দাম তাহলে এখন টেন থাউজেন্ডে এসে থেমেছে! কী বলেন?'

সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করলেন না মধুবন্তী।

'টেন থাউজেন্ড! মেঘনা আপনি বলেছিলেন, এই ঘটনার দুদিন আগে আপনাকে গাড়ি থেকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল কেউ!'

‘হ্যাঁ, বাইপাস দিয়ে আসছিলাম। পার্ক সার্কাস কানেকটরের কাছে একটি জেন এসে আমার ট্যাক্সির পথ আটকায়। গাড়িতে চারজন ইয়ং ছেলে ছিল। আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার বিপদ বুঝে গাড়ির গতি না কমিয়ে স্পিড বাড়িয়ে ওদের কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি সিগন্যালে নেমে অন্য ট্যাক্সিতে উঠে পড়ি। বেঁচে যাই সেবার। নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে দাদু-দিদার বাড়িতে উঠি। উর্মিলা আমার ফ্ল্যাটে ও রান্নার কাজ করে আর দিদার বাড়িতেও। ইনফ্যাক্ট দিদার বাড়িতে আমিই ওকে মাস চারেক হল দিয়েছি।’

মধুবন্তীর নির্দেশে মেরুনকে ডাকা হল এই চেম্বারে এইবার।

মেরুনের প্রবেশ দ্বিতীয় চমক চিন্ময়ী সিদ্ধেশ সঞ্জয় আরতির কাছে।

মধুবন্তীর প্রশ্নের জবাবে মেরুন বলতে শুরু করল, ‘মেঘনার সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব আমার ছিল না কোনওদিনও। কিন্তু মেঘনা আলটিমেটলি বুঝতে পেরেছিল আমি কল্কির যেহেতু কেউ নই, সুতরাং আমি নির্ভরযোগ্য। ওকে বাঁচাতে পারি আর আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। মেঘনা সেদিন বুঝতে পারল পয়জনের ব্যাপারটা, আই মিন, ও খাবারটা খেয়েই ফেলেছিল—’

‘মেঘনা আপনি বলবেন ঠিক কী হয়েছিল?’

‘উর্মিলাদির কফি খাবার সময়েই অন্যরকম একটা টেস্ট পেয়েছি সেদিন। খানিকটা খাওয়ার পরই বুঝতে পেরে গেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নুন জল খেয়ে কিছুটা বমি করে ফেলেছিলাম। আর মেরুনকে ফোন করি। স্টমাক থেকে বুক পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে তখন। আমার দাদু অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেন। আমি প্রাইভেট নার্সিং হোমে অ্যাডমিটেড হই। মেরুন নার্সিং হোমেই চলে আসে। এই প্রথম আমি মেরুনকে সব খুলে বলি। ওর সাহায্য চাই।’

‘পুলিশকে রিপোর্ট করা হয়েছিল?’

‘না। ডক্টরদের অনুরোধ করি। বলি, আমি বয়ফ্রেন্ডের ওপর অভিমান করে নিজেই—। আর রিকোয়েস্ট রাখেন তাঁরা।’

‘কত তারিখে?’

'টোয়েন্টি সেকেন্ড জানুয়ারি।'

'দেন?'

'খুব গোপনে রাতে মেরুনের সঙ্গে চলে আসি ওর বাড়িতে। দাদু দিদা উর্মিলাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন পরেরদিনই।'

'আপনার নেক্সট প্ল্যান কী ছিল? চিন্ময়ীকে খুন?'

'আমি সুপিরিয়রকে সব জানাই।'

'মেরুন জানত এইসব?'

'না। ও আমায় সরে আসতে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু এইভাবে হাইড আউটে কতদিন থাকা যায়? আমি জানতাম আমার খোঁজ ওরা করছেই। কারণ আমি মরলাম কিনা ওরা যতদিন না স্যাঙ্গুইন হচ্ছে, ততদিন ওদের বিপদ।'

'সুপিরিয়র কে?'

'আমি তাকে দেখিনি। কখনও চিন, কখনও ইজরায়েল থেকে ওনার কল আসে।'

'নাম?'

'জানি না। কোড আছে। কোড চেঞ্জ-ও হয়। তবে ওই উইং-এ উনিই একা নন। সেকেন্ড আরও একজন আছে।

'তারপর?'

'উনি নির্দেশ দেন, আমি চাই তুমি কলকাতা তথা হোল ইস্টার্ন রিজিয়নের দায়িত্বে থাকো। যদিও চিন্ময়ীকে চাইছে কোড ISKMOI। সরিয়ে দাও চিন্ময়ীকে। দলের জন্য সি ইজ নো মোর রিকয়ার্ড।'

'ওহ্ শিট্!' বলে লাফিয়ে উঠেছে চিন্ময়ী।

মধুবন্তীর চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আবার শান্ত হয়ে গেল।

'ক্যারি অন মেঘনা।'

'কিন্তু আমি আর এই প্রেশার নিতে পারছিলাম না। রিয়েলি অ্যায়াম গেটিং টায়ার্ড। আমি বেরোলেই ওরা আমায় খুন করে ফেলত। তাই মেরুনের সঙ্গে পরামর্শ করি। ডিসাইডেড টু সারেন্ডার। আমার অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আমার অনেক টাকাপয়সা চলে

গেছে কল্কির জন্য! আমি আর এই খুন-খারাপির মধ্যে থাকতে পারছি না। আই ওয়ান্ট প্রোটেকশন টু লিভ মাই লাইফ ম্যাডাম।'

'সিতিকে মার্ডার করা হল কেন?'

'সিতি এজেন্ট ছিল। জানতাম না প্রথমে। মেরুনের থ্রু দিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ। আসলে কল্কির ব্যাপারে ওদের কাছে খবর ছিল। সিতি আমাদের বুঝতে দেয়নি একটুও। সিতি ইনোসেন্ট সেজে পায়ের অপারেশনও আমাদের ডক্টরকে দিয়ে করায়। ক্যাপসুল ইনপুট করার ব্যাপারটা ও জেনে গেছিল। আসলে ক্যাপসুলের ব্যাপারটা ধরার জন্যই—।

'আই সি!'

'ও আমাদের টোটাল গ্রুপটাকে ধরার জন্যই—! তার আগেই আমরা জেনে যাই। সুপিরিয়র জানায়। নির্দেশ আসে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।'

'মেরুন আপনি সিতির এই গোপন পরিচয় জানতেন?'

'না। কক্ষনো না।'

'আপনার থেকে টাকা ধার নিত সে শুনেছি।'

'হ্যাঁ। কেন জানি না। তবে—' বলতে বলতে দু-চোখ ভারী হয়ে এল মেরুনের, বলল, 'সি ওয়াজ সাচ আ নাইস গার্ল—'

'মেরুন, প্রলয়েশের কাছে এদের আপনি নিয়ে গেছিলেন?'

'সবাইকে নয়। সিতিকে। সিতির কী প্রবলেম হচ্ছিল বলেছিল। ওই আমায় জোর করে—।'

অনঙ্গ বলে ওঠেন, 'দ্যাট মিনস সিতিদেবী প্রলয়েশকেও নক করতে চেয়েছিল কল্কির ব্যাপারে, আমার তাই মনে হচ্ছে।'

মধুবন্তী উত্তর দেন না। অনঙ্গদেবের দিকে ফিরে তাকালেন মাত্র।

এই ক'দিন ঘুম উবে গেছিল মধুবন্তী সেনের। আজ সকালে একটু দেরি করেই ঘুম ভাঙল তাঁর।

শুয়ে শুয়ে এক কাপ চায়ের সঙ্গে নিজেকে জানার একটা খেলা

প্রতিটি ছুটির দিনেই করা তাঁর কলেজ জীবন থেকে অভ্যাস। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

মানুষ চিনছেন। জানছেন। বুঝতে পারছেন দেশপ্রেম ব্যাপারটাকে হাতিয়ার করে সন্ত্রাসবাদী দলগুলো আসলে তরুণ সমাজকে বিপথে চালিত করছে দেশদ্রোহী বানিয়েই।

গুনগুন করে গান গাইছেন মধুবন্তী শুয়ে শুয়ে, 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো হে প্রভু'। সামনে অনেক কাজ। বড়সড় একটা দুর্যোগ থেকে আপাতত বাঁচাতে পেরেছেন শহরটাকে। কিন্তু কল্কির শাখা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অন্য রাজ্যগুলিতে। এখনও অনেক কাজ বাকি।

